Vol. 59 | No. 1-2 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের ছড়া

Volume	59
Issue	1-2
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	December 31, 2024
DOI	10.62328/sp.v59i1-2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i1-2.1
Pages	1-41
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩০॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i1-2

DOI: 10.62328/sp.v59i1-2.1
প্রবন্ধ জমাদান: ১৫ জানুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ৫ মে ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১-৪১

রবীন্দ্রনাথের *ছড়া*

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
উপাচার্য, রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: unab@citechco.net

সারসংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিজীবনের শেষ দিকে ছড়াগ্রন্থ *ছড়া* (১৯৪১) প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে মোট ১১টি ছড়া সংকলিত হয়েছে। ছড়াগুলো লেখার ও প্রকাশের সময় নির্দেশ করার পাশাপাশি ওই সময়ে কবির শারীরিক ও মানসিক অবস্থার মূল্যায়ন করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। *ছড়া* গ্রন্থের ছড়ার বিষয় ও ভাবনা এবং ভাষা ও ছন্দ এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য। একইসঙ্গে গ্রন্থভুক্ত ছড়ার পাণ্ডুলিপি ও বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদের তুলনামূলক আলোচনাও করা হয়েছে। ছড়ার বিষয়, রূপান্তর, পাঠভেদ এবং কবির বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চেতনার স্বল্পালোকিত একটি দিকের উন্মোচন করার প্রয়াস আছে এই লেখায়। ছড়া নিয়ে কয়েকজন বিশ্লেষক-গবেষক এবং রবীন্দ্র-জীবনীকারের মন্তব্যও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনায় এসেছে। এ সবের ভিত্তিতে এবং সরাসরি পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ ও যাচাইয়ের মাধ্যমে *ছড়া*র লেখাগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে; এই সূত্রে কিছু জিজ্ঞাসাও নতুন করে তৈরি হয়েছে।

মূলশব্দ

ছড়া, রবীন্দ্রনাথের ছড়া, ছড়ার পাণ্ডুলিপি, ছড়ার বিষয়, ছড়ার ভাষা, ছড়ার ছন্দ, ছড়ার পাঠভেদ, রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন।

এক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি ছড়ার বই প্রকাশিত হয়েছিল কবিজীবনের শেষ অর্ধযুগে—*খাপছাড়া* (১৯৩৭), *ছড়ার ছবি* (১৯৩৭) ও *ছড়া* (১৯৪১)। *ছড়া* প্রকাশের মাসখানেক আগে কবি মর্ত্যভূমি ত্যাগ করেন। তবে *ছড়ার* প্রেসকপি চূড়ান্তকরণ ও মুদ্রণের কাজ শুরু হয়েছিল কবির জীবদ্দশাতেই। ১৯৪১ সালের ২৫ জুলাই কবিকে অস্ত্রোপচারের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে জোড়াসাঁকোতে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার মুহূর্তে 'বাঙাল' সম্বোধন করে সুধীরচন্দ্র করকে বলেছিলেন: 'এক মাস পরে ফিরব; দেখো ছড়ার বইটি যেন ছাপা হয়ে থাকে (সুধীরচন্দ্র ২০১৪: ১৩৯)।

প্রথম সংস্করণে *ছড়ায়* মোট রচনার সংখ্যা মাত্র ১১টি। ১৩৫৫ সনে *রবীন্দ্র রচনাবলীর* ২৬তম খণ্ডে অন্তর্ভুক্তির সময় এর গ্রন্থপরিচয়ে কানাই সামন্ত সংকলনের প্রথম ও পঞ্চম রচনার দীর্ঘ পাঠান্তর দেন। ৮ বার পুনর্মুদ্রণের পর *ছড়ার* দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হয় ১৩৮০ সনে। কানাই সামন্ত এর 'গ্রন্থপরিচয়ে' আরো পাঠান্তর যুক্ত করেন। পরে *ছড়ার* দুটি রচনা *সঞ্চয়িতায়* অন্তর্ভুক্ত হয়।

কবি *ছড়ার* ১১টি রচনা লিখেছেন ১৯৪০ সাল জুড়ে। মংপুতে মাস দুই কাটিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন ১৯৩৯ সালের ১১ নভেম্বর। এর দুই মাস আগেই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এ সময়ে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পাশ্চাত্যের সমর-রাজনীতি এবং ভারতবর্ষে এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে। সংবাদপত্রে নানা বিবৃতি ও বক্তৃতায় এ সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। পত্রপত্রিকায় কিছু নিবন্ধও লেখেন এ নিয়ে। সঙ্গে লিখেছিলেন *নবজাতক*, *সানাই*, *জন্মদিনে* ও *শেষ লেখার* বেশ কিছু কবিতা এবং ছোটগল্প 'শেষকথা'। ডিসেম্বরে গেলেন মেদিনীপুর; সেখানে বিদ্যাসাগর-গৃহ উদ্বোধন এবং *বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী* প্রকাশের ব্যবস্থা। যাওয়ার পথে হাওড়া স্টেশনে সুভাষ বসু কবির সঙ্গে দেখা করেন; গান্ধী-সুভাষের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করছিলেন কবি—এমনও শোনা যায় (প্রভাতকুমার ১৩৯৫: ১৮০)। ডিসেম্বরের শেষদিকে পৌষ উৎসবে ভাষণ 'অন্তর্দেবতা'। এরপর নতুন বছরের জানুয়ারির ৯ থেকে ১৩ এই ৫ দিনে লিখলেন *সানাই*য়ের ১২টি; পরের সপ্তায় *সানাই*য়ের আরো ৩টি কবিতার সঙ্গে *নবজাতকের* ১টি কবিতা। তাঁর এ সময়ের মানসিক পটভূমি সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৯৫: ১৮১) লিখেছেন:

> ... শরীরও এখন ভাঙনের মুখে।
>
> কবির দিন যাচ্ছে গতানুগতিকভাবে। শরীর অশক্ত, কানে কম শোনেন, চোখেও কম দেখছেন; কিন্তু মন এখনও সবল সুস্থ। সেই মনের খোরাক পাচ্ছেন না।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪০১: ২৫৬) অন্যত্র উল্লেখ করেছেন, ১৯৪০-এর শেষ দিকে এসে কবি প্রায়ই বলতেন 'আর বেশিদিন নয় ... ক্লান্ত হয়ে গেছে মন, এবার বিদায় নিলেই হয়।'

এ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় এ সময়ে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা কবির চিঠিতে (প্রভাতকুমার ১৩৯৫: ১৮১):

> আমার মুশকিল, আমার দেহ ক্লান্ত, তার চেয়ে ক্লান্ত আমার মন; কেননা মন স্থাণু হয়ে আছে, চলাফেরা বন্ধ। তুমি থাকলে মনের মধ্যে স্রোতের ধারা বয়—তার প্রয়োজন যে কত তা আশপাশের লোক বুঝতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের (১৯৭৩: ১৪৪-৪৫) মন্তব্যও সম্পূরক:

> রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে সর্বশেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ছড়া' [প্রকৃতপক্ষে কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত] প্রকাশ হয়। একদিন 'জল পড়ে পাতা নড়ে' এই ছড়াটির মধ্য দিয়ে তখন তাঁর শিশুমনে তিনি যে প্রেরণা লাভ ক'রেছিলেন, জীবনের অন্তিমমুহূর্তে এসে পৌঁছে তার প্রেরণা তাঁর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সর্বাত্মক হয়ে উঠ্‌ল। ...
>
> ... জীবনে বহির্মুখী কর্মচাঞ্চল্য যখন দূর হয়ে যায়, মন যখন অবসরের মধ্যে বিশ্রাম লাভ করতে চায়, তখনই ছড়ার বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো মনের উপর ছায়া ফেলতে থাকে, মনকে কখনো নিষ্ক্রিয় থাকতে দেয় না। রবীন্দ্রনাথও অনুভব করলেন যে, তাঁর সচেতন রসসৃষ্টির যুগের অবসান হয়েছে, এখন মনের সক্রিয়তা আর নেই, তবে মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থার মধ্যেও তার ক্রিয়া সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় না। মনের সেই অলস অবসাদের ভিতর দিয়েই ছড়ার ছবিগুলো তাঁর মনের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। রবীন্দ্র-কাব্য-সাধনারও সক্রিয় যুগের অবসান হয়েছে, কবিমন যখন নিষ্ক্রিয় অবসাদের মধ্যে অবসরের মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল তখন তাঁর মনের উপর ছড়ার ছবিগুলো আপনা থেকে এসে ছায়াপাত করতে লাগল। সেইজন্য জীবনের অন্তিম মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ছড়া রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এদের রচনায় কিংবা ভাবের মধ্যে কোন বন্ধন ছিল না, তখনকার মানসিক অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সেই সর্বসংস্কারমুক্ত বন্ধনহীনতাকেই বরণ ক'রে নিলেন। তাই তিনি অনুভব ক'রেছেন, ছড়াগুলো 'অলস মনের আকাশে' এ'দের আবির্ভাব; অবসন্ন ও অবসাদের জীবনের এ'রা সঙ্গী।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪০১: ২০৫) এসব রচনার পেছনে কবির মনোভূমির বাঁকবদলকে তুলনা করেছেন গ্রাফের বক্ররেখার সঙ্গে—

> জীবনের ভার যখন গুরু, দেহ যখন জরাগ্রস্ত, মন যখন প্রকাশ-অনুকূলতার অভাবে ক্ষণে ক্ষণে স্তব্ধ হয়, তখন কবিচিত্ত, আপনার অন্তর্বেদনাকে শমিত করিবার চেষ্টা করে হাস্য-উপহাসে। গাণিতিক নিয়মে curve-এর মতন যেন ইহার গতিরেখা কঠোর মননজাত কবিতা বা আত্মানুভূত রস-উদ্বেলিত গানের ধারার পরে এই বক্ররেখাগতির পথে হাসির পাথেয় খুঁজিয়া পান। তাই 'জীবনের রস আজ মজ্জায়' রসপ্রলাপ জাগায় ক্ষণে ক্ষণে। সে রসপ্রলাপ কখনো 'প্রহাসিনী'র কৌতুকহাস্যে, কখনো ছড়ার প্রলাপে ব্যক্ত। এইসব ছড়া হালকাভাবের মুক্তশৃঙ্খল কল্পনায় পূর্ণ, দায়িত্বহীন আনন্দকোলাহলে মুখর। শব্দের যোজনায়, বাক্যের বুননে, ছন্দের রণনে বিচিত্র, অদ্ভুত রূপসৃষ্টিতে মন বল্‌গাহারা। কবির এই 'ছড়া'র সূত্রপাত হয় 'খাপছাড়া' ও 'সে'র মধ্যে। তারপর 'ছড়ার ছবি', 'প্রহাসিনী'র মধ্য দিয়া চলে হাসি ও গল্পের কবিপ্রলাপ, 'গল্পসল্পে' তার শেষ।

পূর্বতন বছরের এই মানসপট পেছনে রেখে ১৯৪০ সালের ২০ জানুয়ারি শান্তিনিকেতনের উদীচীতে বসে লিখলেন *ছড়া*র প্রথম রচনা; গ্রন্থে সেটি মুদ্রিত হয়েছে অষ্টম ছড়ারূপে—কোনো সাময়িকপত্রে সেটি প্রকাশ হয়নি। এই ছড়াটি সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর তথ্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের একসময়ের সচিব কবি অমিয় চক্রবর্তী (সনৎকুমার ১৪০০: ২২৬)। *প্রবাসী*র ভাদ্র ১৩৪৮ সংখ্যায় *ছড়া*র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানান—

> 'চুল ছাঁটে চাঁদনির দর্জি' এই লাইনটা এবং পরের অনেকগুলি লাইন কবি একদিন পেয়েছিলেন ঘুমের মধ্যে। জেগে উঠেও মিল থাম্‌তে চায় না, অগত্যা লিখে ফেলতে হ'ল এবং মিল বেড়েই চলল।

তাহলে ছড়াটি কি স্বপ্নে পাওয়া কিছু? এবং *ছড়া*র রচনাগুলোর পটভূমিতে কি 'স্বপ্ন' বা 'ঘুমের মধ্যে' বা অবচেতন মনে পাওয়ার কোনো সম্পর্ক আছে?

মাসখানে পরে ১৭ ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধী কস্তুরাবঈকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। দুইদিন গান্ধী শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সেবার কবি তাঁর অভিপ্রায় জানান লিখিতভাবে—তাঁর অবর্তমানে গান্ধী যেন বিশ্বভারতীর ভার নেন। গান্ধী যে দুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন সেই দুদিনেই কবি রচনা করেন ছড়ার ষষ্ঠ ও চতুর্থ লেখা। কবি ছিলেন উদয়নে, গান্ধী শ্যামলীতে। পরপর ওই লেখা প্রকাশ হয় *প্রবাসী*র চৈত্র ১৩৪৬ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ সংখ্যায়; যথাক্রমে 'শ্রাদ্ধ' ও 'মামলা' শীর্ষনামে।

ফেব্রুয়ারির শেষদিকটা কাটল সিউড়ি ও বাঁকুড়ায়। সুভাস-নেহরু দ্বন্দ্বে কংগ্রেসে যে ভাঙন তা কবিকে পীড়িত করছিল। বাঁকুড়ায় গিয়ে বেশ অসুস্থই হয়ে পড়েছিলেন। কলকাতায় এন্ড্রুজের হাসপাতাল-বাসও তাঁর মনের ওপর চাপ বৃদ্ধি করে। রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়ায় ৩ দিন থেকে ফেরেন মার্চের ৪ তারিখে। এর ৩ দিন পর (৭ মার্চ ১৯৪০) উদয়নে বসে লেখেন: 'সিউড়িতে হরেরাম মৈত্তির ...'। এর দুই সপ্তাহ আগে ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেছিলেন সিউড়ি কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী। পূর্বে উল্লেখিত ছড়াটি *ছড়া*র দশম ছড়া; এটি কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশ হয়নি। সে সময়ে কবি যে নিজেও শরীর সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় ৮ মার্চ সজনীকান্ত দাসকে লেখা চিঠিতে (অনুত্তম ২০০৩: ৫২৩):

> ... বাঁকুড়ায় যে রকম খাটতে হয়েছিল এমন কোথাও হয়নি। মাঝে মাঝে আমার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে ভয়ের কারণ ঘটেছিল। কাউকে বলি নি, কর্তব্য করে গিয়েছি ...।

এই শঙ্কার পরের দিনই (৯ মার্চ ১৯৪০) কবির কাছ থেকে পাই *ছড়া*য় সংকলিত তৃতীয় রচনা, উদয়নে বসে লেখা। লেখাটি 'পরিস্থিতি' নামে *প্রবাসী*র বৈশাখ ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশ হয়। পরের সপ্তায় (১৭ মার্চ ১৯৪০) উদয়নে বসে লেখেন, 'আজ হল রবিবার ...'। রচনাটি 'রবিবারি সংস্করণ' নামে প্রথমে *বঙ্গলক্ষ্মী*তে (বৈশাখ ১৩৪৭) ও পরে *প্রবাসী*তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) প্রকাশ হয়।

জীবনের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ জন্মদিন পালন করতেন বাংলা নববর্ষের দিনে। মার্চের শেষদিক থেকে তার প্রস্তুতি শুরু হতো। কবি এ বিষয়ে তখন পুরীতে অবস্থানরত অমিয় চক্রবর্তীকে ৩১ মার্চ লিখছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬: ৩২৫-২৬):

> ... আমাকে তৈরি হতে হবে, পয়লা বৈশাখের জন্যে—কিন্তু মন তৈরি হবার সময় পাচ্ছে না। এই রকম অবস্থায় সুদূরে কোথাও দৌড় মারতে ইচ্ছে করে কিন্তু সেই সুদূরও হয়তো তাড়া করবে। Yeats-এর সেই দ্বীপটা কোথায় জানো? স্বয়ং কবিও তার সন্ধান পান নি। আকাশ প্রদীপ আকাশ কুসুম বনের ইশারা করে কিন্তু পথ দেখায় না। আসল পথটা সেইখানেই সেখানে আজ শালের মঞ্জরি ধরেছে আর অজয় নদীর ধারে নাগকেশরের বনের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

এই অবস্থায় ২৭ মার্চে (১৪ চৈত্র ১৩৪৬) লেখেন 'চলচ্চিত্র'র প্রথম খসড়া। 'চলচ্চিত্র' পূর্ণরূপ পায় আরো পরে। তবে এর মধ্যে দ্বিতীয় ছড়াটিরও বীজ ছিল। কানাই সামন্তের বিশ্লেষণে (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬: ৬৩) '... এই কবিতার প্রথম স্তবকের শেষ দশ ছত্রে *ছড়া*র দ্বিতীয় কবিতার অঙ্কুর বা পূর্বাভাস রহিয়াছে সন্দেহ নাই।' মার্চের বাকি কয়েক দিন আর এপ্রিলের প্রথম সপ্তায় কবি রচনা করেন *সানাই*য়ের ৩টি আর *নবজাতকে*র ৪টি কবিতা। আর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ১ বৈশাখ প্রদান করলেন তাঁর বিখ্যাত অভিভাষণ 'সভ্যতার সংকট'।

১৯৪০ সালের এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে গেলেন মংপু—১৭ এপ্রিলে কলকাতা এসে মংপু পৌঁছালেন ২১ এপ্রিল; অবস্থান মৈত্রেয়ী দেবীর বাসভবনে। তাঁর এ সময়ের মানসপট চিত্রিত হয়েছে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৩৯৫: ১৮১) বয়ানে—

> মন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে অক্ষম, দেহ যদৃচ্ছ বিচরণ করতে অশক্ত, আপনাকে দেখে আপনার হাসি পায়—মনের সেই অবস্থায় 'খাপছাড়া' কবিতা লেখেন মনটাকে চাঙ্গা করবার উদ্দেশে। ... আপন আনন্দে 'ছড়া' কাটেন মনের মধ্যে যে শিশু ভোলানাথ আছে তাকেই ভোলাতে—আর তারই সাহচর্যে ভুলতে বিষয়ীর বিষম-রিপু-তাড়িত গরলমথিত বিশ্বসংসার।
>
> দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র দলাদলি, রেষারেষি, সাম্প্রদায়িকতার দাঙ্গা, নারীহরণ ও নারী-উৎপীড়ন; দেশের বাইরে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ—এসব খবর নিত্যই শোনেন আর আহত মনটাকে হাল্কা করবার জন্য ছড়া কেটে বিদ্রুপ করে বলেন ...
>
> আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, জাতিগত অনাচার বা অত্যাচারকে কবিতা লিখে ধিকৃত করেন—আর কীই-বা করতে পারেন এ বয়সে।

মংপুবাসের প্রথম কয়েকদিনে পাওয়া গেল *সানাই*য়ের জন্য কয়েকটি নতুন কবিতা। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ *ছেলেবেলা*র পদ্য খসড়াটি শুরু করেন এই সময়েই; প্রথম দুটি অংশ লিখলেন ২৪ ও ২৮ এপ্রিল। এর পরই লিখলেন *ছড়া*য় সংকলিত দ্বিতীয় রচনাটি—'কদমাগঞ্জ উজাড় করে ...'। লেখার শেষে রবীন্দ্ররীতিতে লেখা আছে, 'মংপু ২৮ এপ্রিল—২ মে ১৯৪০'। কবি কি ৫ দিন ধরে ছড়াটি লিখেছিলেন? ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এর বীজ রয়েছে ২৭ মার্চ তারিখে রচিত ছড়ায়। *গল্পসল্প*র রচনাগুলোও পাওয়া যায় এই সময়ে।

এই ছড়াটি রচনার দিনে কবি যে কতটা আবেগ-আপ্লুত ছিলেন, তা জানা যায় মৈত্রেয়ী দেবীর (১৯৬৭: ১৮০) বর্ণনা থেকে। কবি জানাচ্ছেন:

> আজ আমায় পাগলামিতে পেয়েছে; যা রোদ উঠেছে, কবির মাথায় মিলগুলোকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে মিলের স্কন্ধে চেপে।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সমিল পদ্যে নতুন কিছু দিতে পারছেন না তাই গদ্যছন্দে লিখছেন এমন কোনো ইঙ্গিত তাঁকে পীড়িত করেছিল। *ছড়া* রচনা করে মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছেন (মৈত্রেয়ী ১৯৬৭: ১৭৮):

> আজকাল আমার এই ছড়াগুলোতে কিন্তু কম মিল ছড়াইনি; তুমি যে সন্দেহ করছ মিল আমার আসে না ব'লে আমি গদ্য ছন্দ লিখছি, তা নয়—সেইটে প্রমাণ করবার জন্যই তো এত উঠেপড়ে মিল ছড়াচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই তোমাকে convince করতে পারছি না।
>
> বাসাখানি গায়ে লাগা আর্মানি গির্জার—
দুই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জার।
কাবুলি বেড়াল নিয়ে দু'দলের মোক্তার
বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোখ তার। ...
>
> মিল একেবারে দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছি আর একেবারে নিখুঁত মিল তা মানতে হবে!

কবি এই ছড়ালেখা শেষ করে ৭ মে লিখলেন *শেষ লেখার* দ্বিতীয় কবিতাটি। এবারে কবির জন্মদিবস পালিত হলো মংপুর পাহাড়ে; তাঁর নিজের বর্ণনায়, 'অপরাহ্ণে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে/পাহাড়িয়া যত।'

৭ মে পর্যন্ত মংপুতে থেকে পরদিন কালিম্পঙ যাত্রা। সেদিন লিখলেন সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু অভিঘাতে 'রাহুর মতন মৃত্যু'। কালিম্পঙে কবির সঙ্গে যোগ দিলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। মে ১৫-তে পাওয়া গেল *ছড়ার* প্রথম রচনাটি; সঙ্গে *রোগশয্যায়ের* দ্বিতীয় কবিতাটি। পরের সপ্তায় *সানাই* ও *জন্মদিনে* সংকলিত কয়েকটি রচনা। *ছড়ায়* গ্রন্থিত প্রথম রচনাটির পটভূমি অন্তত বেশ কয়েক মাস আগের। অনুত্তম ভট্টাচার্য (২০০৩: ৫১৯) উল্লেখ করেছেন, ইতিপূর্বে কবি *শনিবারের চিঠির* সম্পাদক সজনীকান্ত দাসকে 'অবচেতনার অবদান' শীর্ষনামে একটি স্কেচ এঁকে দেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন কোনো একসময় ওই স্কেচের সঙ্গে একটি কবিতা রচনা করে দেবেন। সজনীকান্ত ওই লেখার জন্য তাগাদা দিলে কবি ১৯৪০-এর ২০ জানুয়ারি তাঁকে লেখেন:

> অবচেতনার অবদান সম্বন্ধে তোমাকে মুখে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম তার কোনো আইনসঙ্গত দাম নেই। লেখনযোগে পাকা দলিলে দিতে পারি যদি এখানে ঝাড়গাঁর সংস্রব লাভ করি। অতএব সেজন্যে সবুর করতে হবে।

১৮ মে ১৯৪০-এ কালিম্পঙ থেকে একটা ছড়া পাঠিয়ে লিখলেন, ‘সজনী, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম তোমাকে একটা ছড়া দেব, সেটা রক্ষা করলুম।’ অনুত্তম ভট্টাচার্যও দাবি করেছেন যে সেটিই আলোচ্য প্রথম ছড়া।

কবির এ সময়ের মানস-পরিমণ্ডল জানা যায় মৈত্রেয়ী দেবীর স্মৃতিকথায় (মৈত্রেয়ী ১৯৬৭: ?):

> আপন মনে দিন কেটে যায় কবির মংপুতে। কবিতা লেখা চলে নানা রকম। কখনো লিরিক, কখনো ছড়া। শান্তিনিকেতনে গোঁসাইজির কাছ থেকে ছেলেদের জন্য কিছু লেখবার অনুরোধ এলে কবি ছড়া লেখায় মনোনিবেশ করেন। ছড়ার রাজ্যে বিচরণ করতে করতে কবির মনে পড়ে যায় পুরাতন জীবনের কথা—ছেলেবেলার নানা স্মৃতি। এ থেকেই সৃষ্টি হয় ‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থখানি।

এরপর আরো মাস দেড়েক কালিম্পঙ বাস। তাতে *সানাই* ও *জন্মদিনে*র কিছু কবিতা পাওয়া গেলেও ছড়ার কোনো রচনা নেই।

কালিম্পঙ থেকে কলকাতা এলেন ২৯ জুন; ৪ দিন পর ফিরলেন শান্তিনিকেতনে। কলকাতায় কবির সঙ্গে দেখা করেন সুভাষ বসু। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং কংগ্রেসের রাজনীতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলাপ হয়ে থাকতে পারে। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট ডিগ্রি দিল কবিকে। শান্তিনিকেতনে জমকালো অনুষ্ঠান হলো সে উপলক্ষ্যে। জুলাইয়ে *সানাই*য়ের কয়েকটি কবিতা লিখলেও ছড়া পাওয়া গেল না। *ছড়া*র পঞ্চম রচনাটি পাওয়া গেল ২১ আগস্ট; এর আগের ছড়ার ৯ সপ্তাহ পরে। কিন্তু পরের ৩ মাসে *ছড়া*র কোনো রচনা পাওয়া যায়নি। এর কারণ জানা যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৩৯৫: ১৮২-৮৩) বর্ণনায়:

> দিনগুলি যাচ্ছে মন্থরগতিতে। শরীর ভেঙে পড়ছে—হাঁটতে কষ্ট হয়, ঠেলাগাড়িতে চলাফেরা করেন, চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে, কানেও কম শুনছেন। তা সত্ত্বেও ছোটোবড়ো কাজের জন্য লোক আসে, লেখার তাগিদ আসে। ...
>
> শান্তিনিকেতনে মন টিকছে না। কলকাতায় এলে ‘চলাফেরা’ সম্পর্কে ডাক্তারেরা সাবধান করে দিলেন। কিন্তু একবার ঝোঁক উঠলে সেবকদের পক্ষে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করা কঠিন। ... প্রতিমা দেবী কালিম্পঙে—কবি সেখানে গেলেন।

এ সময়ে কবির অন্তর্ভাবনা জানা যায় অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে (প্রভাতকুমার ১৩৯৫: ১৮৩):

> কিছুদিন থেকে আমার শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়ছে, দিনগুলো বহন করা যেন অসাধ্য বোধ হয়, তবুও কাজ করতে হয়—তাতে এত অরুচিবোধ—সে আর বলতে পারি নে। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই যেখানে পালিয়ে থাকা যায়। ভিতরের যন্ত্রগুলো কোথাও কোথাও বিকল হয়ে গেছে। ... বিধান রায় কালিম্পঙ যেতে নিষেধ করেছিলেন। মন বিশ্রামের জন্য এমন ব্যাকুল হয়েছে যে তাঁর নিষেধ মানা সম্ভব হল না। চল্‌লুম আজ কালিম্পঙ।

এ সময়ে লেখা কয়েকটি কবিতার নিচে দেওয়া তারিখ ও প্রতিমা দেবীর বয়ান থেকে মনে হয় সেপ্টেম্বরের ১৮/১৯ তারিখে কালিম্পঙের গৌরীপুর ভবনে পৌঁছান কবি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অসুস্থতা থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অজ্ঞান অবস্থাতেই অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসা চলে এক মাস ধরে। এই পর্বেই শুরু হয় শ্রুতিলিখনের সাহায্য নিয়ে কবিতা লেখা। এর বেশ কিছু কবিতা *রোগশয্যায়* (সম্ভবত ৩ থেকে ১৪) সংকলিত।

এ পর্বে কবির মানসজগতের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর (ঠাকুর) (১৩৪৯: ৩৪-৩৫) বর্ণনায়:

> অক্টোবর-নভেম্বর কলকাতায় কেটে গেল, এই সময় ডাক্তারদের মধ্যে আবার আলোচনা হোতে লাগল অপারেশন হোতে পারে কিনা। কিন্তু সার্ নীলরতনের মত না হওয়াতে তখনকার মতো অপারেশন স্থগিত রইল। প্রথম মাস বাবা-মশায়ের চেতনা ঝাপসা ছিল, মাঝে-মাঝে সচেতন হতেন আবার ঝিমিয়ে পড়তেন, দ্বিতীয় মাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে পান এবং মুখে-মুখে ছড়া তৈরি করেন, কবিতা লিখতে থাকেন, সেই সময় আশেপাশে যাঁরা থাকতেন তাঁরা টুকে নিতেন সেই সব রচনা। ডাক্তারদের মতে তখনকার মতো বিপজ্জনক সময় কেটে গেলেও তিনি পূর্বের মতো সুস্থ হোতে পারেননি। তখন তিনি রুগী। ডাক্তাররা নভেম্বর মাসে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন।

পূর্ণ সুস্থ না হলেও ১৮ নভেম্বর ১৯৪০ কবি ফিরলেন শান্তিনিকেতনে। অন্যের সেবার ওপর নির্ভর করে চলতে হচ্ছে। কবি অনুভব করছেন ‘যারা কাছে আছে এ নিঃস্ব প্রহরে,/ পরিচ্ছন্ন প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়/ তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে ...।’ এই মানসিক অবস্থার মধ্যেও শান্তিনিকেতন পৌঁছার পরদিন পুনশ্চতে বসে লিখে ফেললেন *ছড়া*র সপ্তম রচনাটি। বাংলা হিসেবে রচনাকাল ৩ অগ্রহায়ণ; সে মাসেই *শনিবারের চিঠি*তে প্রকাশ হলো ‘অবচেতনার অবদান’ শিরোনাম দিয়ে। মূল রচনাটির শুরুর আগে মুদ্রিত হয় রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত মন্তব্য:

> অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতনবুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ ক’রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হ’লেই আশাজনক হবে।

রচনাটির সঙ্গে মুদ্রিত হয় এর এক বছর আগে কবির আঁকা (২১.১১.৩৯) একটি কৌতুক চিত্র (কার্টুন?) এবং ক্যাপশন হিসেবে ‘সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি’ বাক্যাংশটি।

কবিকে খানিকটা অসুস্থ অবস্থায় শান্তিনিকেতন পাঠানো হয়েছিল নীলরতন সরকার ও বিধানচন্দ্র রায়সহ খ্যাতনামা ডাক্তারদের পরামর্শে। তাঁদের আশা ছিল, শান্তিনিকেতনের পরিবেশ তাঁকে সুস্থ করে তুলবে। যাত্রার সময় এবং শান্তিনিকেতন পৌঁছে কবি প্রফুল্লও হয়েছিলেন, এমন প্রতিবেদন পাওয়া যায় সে সময়ের *আনন্দবাজার পত্রিকায়*। কবি আর পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। তবে রুগ্‌ণ অবস্থায়ও কবির মন ছিল অনেকটা সজীব। প্রতিমা দেবী (১৩৪৯: ২৮, ৪২, ৫২) জানিয়েছেন:

> ... রোগের গ্লানি শরীরে খুবই থাকত, কিন্তু তবু কেউ দেখা করতে এলে সৌজন্য এবং হাস্যালাপের ব্যাঘাত হত না। তাঁর অনুচরদের সঙ্গে হাস্যকৌতুক করে গৃহকে উজ্জ্বল করে রাখতেন, রুগীর ঘর বলে একটুও মনে হত না। তিনি এই সময় সেবাগৃহের জন্য বিশেষ একটি ভাষাও তৈরি করে রেখেছিলেন। ... তাঁর জীবনের অন্যতম বিশেষত্ব কৌতুকপ্রিয়তা তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে এসেছিলেন, জীবনের অন্ধকার দিনেও প্রাণ খুলে হাসতে পারতেন।
>
> ... তাঁর তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়বোধ তখন ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, কানে খুবই কম শুনতে পেতেন ... দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল, অতি ধীরে একটি-একটি করে অক্ষর লিখতেন ... যে-কলম ছিল তাঁর সৃষ্টি-কাজের অব্যর্থ যন্ত্র, তাতেও আজ তাঁর দাবি নেই। অন্যের সাহায্য নিতে হয়। ...
>
> ... এই সময় তাঁর আঙ্গুল আরো অসাড় হয়ে এসেছে ... তিনি আর কলম ধরতে পারতেন না।

এই অবস্থায় কবিকে নিয়ে আসা হয়েছে উদয়নে। ২৮ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখে তাঁর সচিব অনিল কুমার চন্দ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে অনুরোধ করেন, আগন্তুকরা যাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না আসেন অথবা উত্তরের প্রত্যাশায় পত্র না লেখেন (অনুত্তম ২০০৩: ৫৩৪)। এই অতি অসুস্থতার মধ্যেই কবি মুখে মুখে বলেন বেশ কয়েকটি কবিতা; *আরোগ্য*, *রোগশয্যায়* ও *শেষ লেখায়* পরে সেগুলি সংকলিত হয়। ডিসেম্বরের ৫ তারিখে লেখেন *ছড়া*র সর্বশেষ রচনা, একাদশ ছড়া। এটি কোনো সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়নি।

মনে হয় ১৯৪০-এর ডিসেম্বরের মধ্যেই কবি *ছড়া*র প্রেসকপি তৈরি করে নিয়েছিলেন। ডিসেম্বরের শেষদিকে তাঁর শরীর এত খারাপ ছিল যে, শান্তিনিকেতনে থেকেও '৭ই পৌষের উৎসবে আসনগ্রহণ করতে' পারেননি। *ছড়া*র প্রবেশকরূপে মুদ্রিত রচনাটি পাওয়া গেল ১৯৪১ সালের জানুয়ারির ৫ তারিখে; উদয়নে রচিত। *শনিবারের চিঠি*র মাঘ ১৩৪৭ সংখ্যায় রচনাটি ছাপা হলো 'প্রশ্ন' শিরোনামে; পরের মাসের *প্রবাসী*তে একই রচনা প্রকাশ হলো 'কষ্টিপাথর' শীর্ষনামে। তবে জুলাই মাস পর্যন্ত *ছড়া*র মুদ্রণকাজ শেষ হয়নি। ২৫ জুলাই শান্তিনিকেতন থেকে শেষ বার কলকাতা যাবার সময় কবি আশা করেছিলেন এক মাস পর ফিরে বইটি দেখবেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর শান্তিনিকেতনে ফেরেননি। ছড়াগ্রন্থটি প্রকাশ হলো মৃত্যুর পরের মাসে, ভাদ্র ১৩৪৮ সনে।

দুই

*ছড়া*র পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রথম জ্ঞানগর্ভ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলোচনা পাওয়া যায় এই গ্রন্থ যখন *রবীন্দ্র রচনাবলী*র ২৬তম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়, ১৩৫৫ সনে কবির মৃত্যুর ৭ বছর পরে। গ্রন্থপরিচয় তৈরি করতে গিয়ে কানাই সামন্ত তৎকালে রবীন্দ্র সদনে সংরক্ষিত *ছড়া*র কয়েকটি রচনার পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ করেন। তাতে দেখা যায়, 'প্রবেশক'-সহ ছড়ার ১২টি রচনার মধ্যে ৮টিই বিভিন্ন সাময়িকপত্র বা সাহিত্যপত্রে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। *ছড়া*র ২, ৮, ১০ ও ১১ সংখ্যক রচনা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে প্রকাশ হয়নি। সাহিত্যপত্রে প্রকাশের সময় প্রতিটি

রচনার নাম ছিল; কানাই সামন্ত পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত ৪টি রচনার শিরোনামও দিয়েছেন। তবে এর উৎস পাণ্ডুলিপিই কি না, তা স্পষ্ট নয়।

*ছড়া*র প্রথম সংস্করণের ৮টি পুনর্মুদ্রণের পর নতুন সংস্করণ হয় ১৩৮০ সনের আষাঢ়ে। কানাই সামন্ত জানান যে, 'সম্প্রতি পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনার ফলে নূতন সংস্করণ (১৩৮০) ছড়ার গ্রন্থপরিচয়ে নূতন তথ্যাদি সন্নিবিষ্ট' হয়েছে (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬ক: ৬৪৭)। গ্রন্থের এই সংস্করণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর মুদ্রণের সময় 'পূর্বসংস্করণ, পত্রিকা ও পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনায় প্রচলিত কতকগুলি পাঠ ও মুদ্রণ-প্রমাদ সংশোধন' 'করে ওই সংস্করণ প্রস্তুত করা' হয়েছে। কানাই সামন্ত এর 'গ্রন্থপরিচয়ে' মন্তব্য করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬: ৬০):

> রবীন্দ্রনাথের এক পাণ্ডুলিপি হইতে আর-এক পাণ্ডুলিপিতে, অন্যের হাতের এক নকল হইতে আর-এক নকলে (প্রায়শই কবির নিজের হাতের বিবিধ 'সংশোধনে' ও কম-বেশি সংযোজনে সমৃদ্ধ এবং তাৎপর্যবান), ছড়ার অধিকাংশ কবিতায় পাঠের পরিবর্তন বা বিবর্তন অল্প হয় নাই—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

*রবীন্দ্র রচনাবলী*র গ্রন্থপরিচয়ে কানাই সামন্ত দুটি রচনার পূর্বপাঠ দিয়েছেন—প্রথম ও পঞ্চম। *ছড়ায়* *শনিবারের চিঠি*তে রবীন্দ্র হস্তাক্ষর নিয়ে প্রকাশিত প্রথম ছড়ার পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। এই পাঠের সঙ্গে গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ তুলনা করলে দেখা যায়, গ্রন্থের পাঠে ১৪টি অতিরিক্ত পঙ্‌ক্তি রয়েছে। পূর্বপাঠের ১০ পঙ্‌ক্তির পরে ৪টি এবং ১৪ পঙ্‌ক্তির পরে ১০টি। ফলে পূর্বপাঠ যেখানে ৩০ পঙ্‌ক্তির; বর্তমান পাঠ সেখানে ৪৪ পঙ্‌ক্তির। পূর্বপাঠের চরণেও বহু শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন:

	পূর্বপাঠ	**চূড়ান্ত পাঠ**
পঙ্‌ক্তি	৩—মনিবমিঞা	৩—বাঁদরওয়ালা
	৭—মোটা গলার	৭—ভারী গলার
	১০—বাতাস জুড়ে	১০—বাতাসেতে
	১৭—লাগ্‌ল ধাঁধা	৩১—লাগল ধোঁকা
	১৮—ফিজিক্স পড়ে	৩২—পড়াশোনায়
	২১—এই নিয়ে	৩৫—এর পরে
	২২—হায় রে কারো ভাঙল কপাল	৩৬—চক্ষে দেখায় সর্ষের ফুল
	২৩—গোলদিঘি লালদিঘি জুড়ে	৩৭—পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে
	২৫—সিন্ধুপারে মৃত্যুদূতের	৩৯—সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে
	২৯—ছেলেরা সব হাততালি দেয়	৪৩—রামছাগলের দাড়ি নড়ে
	৩০—গভীর জলে কাৎলা খেলায়	৪৪—কাৎলা মারে লেজের ঝাপট।

*ছড়া*র পঞ্চম রচনাটি ছাপা হয়েছিল *আনন্দবাজারে* ১৩৪৭ সনের শারদীয় সংখ্যায়। *রবীন্দ্র রচনাবলী*র ২৬ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে কানাই সামন্ত এর একটি পাঠভেদ উপস্থাপন করেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, ওই পাঠে *ছড়া*র 'দ্বিতীয় কবিতার পূর্বাভাস পাওয়া যায়'

(রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬ক: ৬৪৪)। *ছড়ার* ১৩৮০-র সংস্করণে তিনি আরো পরিষ্কার করে লেখেন যে '২৭ মার্চ ১৯৪০ (১৪ চৈত্র ১৩৪৬) তারিখে লেখা এই কবিতায় প্রথম স্তবকের শেষ দশ ছত্রে ছড়ার দ্বিতীয় কবিতার অঙ্কুর বা পূর্বাভাস রহিয়াছে সন্দেহ নাই' (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬: ৬৩)। দ্বিতীয় কবিতাটি লেখা হয়েছিল মংপুতে ২৮ এপ্রিল; অর্থাৎ 'চলচ্চিত্র'র পূর্বপাঠের এক মাস পরে। *সঞ্চয়িতার* ১৩৫০ সংস্করণের গ্রন্থপরিচয় অংশে পূর্বপাঠটি মুদ্রিত হয় এবং পরে *চিত্রবিচিত্রের* (১৩৬১) অন্তর্ভুক্ত হয়। কানাই সামন্ত উল্লেখ করেছেন, পূর্বপাঠের শেষ স্তবক সমাপ্ত করে কবি এতে তারিখ দেন ২৭/৩/৪০ (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬: ৬৩)। পরে সংশোধন করে আর তারিখ দেননি। তবে কানাই সামন্তের অনুমান, মূল খসড়ার 'হয়তো দু-এক দিনের মধ্যে' সংশোধনগুলো হয়েছে। তাহলে গ্রন্থে রচনাটির তারিখ ২১ আগস্ট ১৯৪০ কেন? কানাই সামন্তের ব্যাখ্যায় জানা যায় (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬: ৬৪):

> প্রথম-লেখা চলচ্চিত্রের অবশিষ্ট ছত্রগুলি কবি ত্যাগ করিলেন না। বিবিধ যোগ-বিয়োগের ভিতর দিয়া নবরূপ লইল নবতর চলচ্চিত্র কবিতায়—গ্রন্থে অদ্যাবধি যাহার রচনাকাল ২০ অগস্ট নির্দিষ্ট হইলেও, আনন্দবাজার পত্রিকায় ২১ অগস্ট্ ১৯৪০। বস্তুতঃ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র সদনের একগুচ্ছ আল্‌গা পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, ছড়ার এই পঞ্চম কবিতার পরিচিত পাঠের নকল একরূপ সমাধা করিয়া '২০/৮/৪০' এই তারিখ দেওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে যোগ করেন শেষ স্তবকের অব্যবহিত পূর্বে ২৮ ছত্র বা ৭ শ্লোক: নিমের ডালে পাখীর ছানা ইত্যাদি। অতএব ২০ অগস্ট্ ১৯৪০ বা ৪ ভাদ্র ১৩৪৭ তারিখে আলোচ্য কবিতার প্রায় সবটা লেখা হইয়া গেলেও, শেষোক্ত ২৮ ছত্র ২১ অগস্ট্ বা ৫ ভাদ্র তারিখে যোগ করা হয়—ইহা মানিয়া লওয়া যায়। ১৩৪৬ সনের ১৪ চৈত্রে যাহার একরূপ সূচনা, ১৩৪৭ বৈশাখে অংশবিশেষ স্বতন্ত্র পরিণতি লাভ করার পরে, তাহার সর্বশেষ রূপান্তর-পরিগ্রহ ১৩৪৭ ভাদ্রের ৪/৫ তারিখে—ইহা কৌতূহলজনক সন্দেহ নাই।

কানাই সামন্তের এ সকল পর্যবেক্ষণ পটভূমিতে রেখে আমরা 'চলচ্চিত্র'র পূর্বপাঠ এবং *ছড়া* গ্রন্থের দ্বিতীয় ও পঞ্চম রচনার তুলনামূলক বিচারে প্রয়াসী।

'চলচ্চিত্র'র পূর্বপাঠে মোট ৫২টি ছত্র রয়েছে। এর ২৯টি ছত্র অবিকৃতভাবে অথবা সামান্য পরিবর্তিতরূপে পঞ্চম রচনাটিতে পাওয়া যায়। পঞ্চম রচনাটিরও ছত্রসংখ্যা ৫২। অর্থাৎ এতে ২৩টি সম্পূর্ণ নতুন ছত্র রয়েছে। আবার পূর্বপাঠের ৮টি ছত্র প্রায় অবিকৃতরূপে এবং ২টি পঙ্‌ক্তির ভাব দ্বিতীয় রচনাটিতে রয়েছে। পূর্বপাঠের মোট ১২ ছত্র দ্বিতীয় অথবা পঞ্চম—কোনো পাঠেই নেই। এর প্রথম ৬ ছত্র নিম্নরূপ:

> মাথার থেকে ধানী রঙের ওড়নাখানা সরে যায়,
> চীনের টবে হাস্‌নুহানার গন্ধে বাতাস ভরে যায়।
> তিনটে পাঠান মালী আছে নবাবজাদার বাগানে,
> দুয়ারে তার ডালকুত্তো চীৎকারে-রাত-জাগানে।
> ধানশ্রীতে সানাই বাজে কুঞ্জবাবুর ফটকে,
> দেউড়িতে ভিড় জমে গেছে নাটক দেখার চটকে।

এ ছাড়াও পূর্বপাঠের ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৭ এবং ৩৪ সংখ্যক পঙ্‌ক্তি *ছড়ার* দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংখ্যক রচনায় নেই।

'চলচ্চিত্র'র পূর্বপাঠের ৮টি ছত্র (১৩-২০) *ছড়ার* দ্বিতীয় রচনার ৮ পঙ্‌ক্তিরূপে (৭-১৪) প্রায় হুবহু ব্যবহার হয়েছে। তবে এত কদমা যে নদীতে পড়ে নদীর জলই শরবত হয়ে গেল, তার ব্যাখ্যা দু-ছড়ায় দু-রকম। পূর্বপাঠে পাওয়া যায়—

সের পঁচিশেক কদমা ছিল কলুবুড়ির ধামাতে,
জলের মধ্যে উল্‌টে গেল ঘাটের ধারে নামাতে।

পূর্বপাঠের এক মাস পরে রবীন্দ্রনাথ যখন মংপুতে বসে দ্বিতীয় ছড়াটি লেখেন, তখন বোধহয় অনুধাবন করেছিলেন যে, সামান্য ২৫ সের কদমা দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের পাঁচমোহনার পানি মিষ্টি করে ফেলা সম্ভব নয়। তাই নদীতে কদমা মিশ্রণের পটভূমি একেবারেই বদলে গেল—

কদমাগঞ্জ উজাড় করে/আসছিল মাল মালদহে,
চড়ায় প'ড়ে নৌকোডুবি/হল যখন কালদহে
তলিয়ে গেল অগাধ জলে/বস্তা বস্তা কদমা যে ...

'চলচ্চিত্র'র পূর্বপাঠের যে ২৯ ছত্র চূড়ান্ত পাঠে স্থান পেয়েছিল তার ১০-১১টিতে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই বললেই চলে। অন্য ছত্রগুলোতে পরিবর্তন হয়েছে বিষয়, ভাষায়; এমনকি ছন্দ ও মাত্রার মধ্যেও। যেমন পূর্বপাঠে—

ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে বসে আছেন কন্যে,
মোচার ঘণ্ট বানাতে চান কোন্ মানুষের জন্যে।
গামলা চেটে পরখ করে গাইটা দড়ি-বাঁধা,
উঠোনের এক কোণে জমা কয়লাগুঁড়োর গাদা।

পঞ্চম ছড়ায় পাওয়া যায়—

ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে/বসে আছেন সেজো বউ,
মোচার ঘণ্ট বানাতে সে/সবার চেয়ে কেজো বউ।
গামলা চেটে পরখ করে/দড়ি দিয়ে বাঁধা গাই,
উঠোনের এক কোণে জমা/রান্নাঘরের গাদা ছাই।

বলা যায় 'চলচ্চিত্র'র পূর্বপাঠ থেকে *ছড়ার* দুটি রচনা বিকশিত হলেও পূর্বপাঠটিও পৃথক রচনা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে আপত্তি নেই। কারণ পূর্বপাঠটি *সঞ্চয়িতার* ১৩৫০ সংস্করণে স্থান পেয়েছিল।

ছড়ার ষষ্ঠ রচনা 'শ্রাদ্ধ'র পাণ্ডুলিপিস্থিত পাঠ নিয়েও দীর্ঘ চর্চা ও বিশ্লেষণ করেছেন কানাই সামন্ত। তিনি এই রচনার প্রথম পাঠটি পেয়েছেন ১৯৩৯ সালের একটি ডায়েরির ৬৪ ও ৬৫ পৃষ্ঠায়; রবীন্দ্র সদনে পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১৬০। এতে পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৩০; 'অল্প পরিমাণ যোগ-বিয়োগ/পরিবর্তনে'র কারণে কাটাকুটি থাকলেও পরিবর্তন-পূর্ব পাঠ পঠনযোগ্য ছিল

(রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬: ৬৫)। *ছড়া*র গ্রন্থপরিচয়ে কানাই সামন্ত ৩০ ছত্রের এই পাঠটি উদ্ধৃত করেছেন।

আমরা *ছড়ায়* মুদ্রিত চূড়ান্ত পাঠের সঙ্গে ৩০ ছত্রের এই পাঠটি মিলিয়ে দেখেছি। দেখা যাচ্ছে যে, ৩০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে ২৬ পঙ্‌ক্তিই চূড়ান্ত-পাঠে গৃহীত হয়েছে। শুধু ৭, ৮, ১৫ ও ১৬ পঙ্‌ক্তি বাদ পড়েছে। তবে এর কিছু পঙ্‌ক্তি পরিবর্তিত আকারে স্থান পেয়েছে। যেমন—

চূড়ান্ত পাঠ: সর্ষে যে চাই মণ দু-তিনেক ঝোলে-ঝালে বাটনায়,
কালুবাবু তারি খোঁজে গেলেন ধেয়ে পাটনায়।
পূর্বপাঠ: লঙ্কা দিল, আর দিয়েছে কালো জিরের বাটনা,
কালুবাবু আলুর খোঁজে চলে গেছে পাটনা।

চূড়ান্ত পাঠ: ও পারেতে খড়্‌গপুরে কাঠি পড়ে বাজনায়,
মুশিবাবু হিসেব ভোলে জমিদারের খাজনায়।
পূর্বপাঠ: খড়্‌গপুরের বাজন্দারে মাতায় গড়ের বাজনাতে
গোমস্তারা ভুলে গেল জমিদারের খাজনাতে।

চূড়ান্ত পাঠ: সাঁৎরাগাছির নাচনমণি কাটতে গেল সাঁতার,
হায় রে কোথায় ভাসিয়ে দিল সোনার সিঁথি মাথার।
পূর্বপাঠ: সাঁৎরাগাছির বরের পিসি সাঁতার কাটতে গিয়ে
শাঁখা কোথায় ভেসে গেল করল সে যে কী এ।

পাণ্ডুলিপিতে এই পূর্বপাঠের অব্যবহিত পূর্বে *নবজাতক* কাব্যের 'রূপ-বিরূপ' কবিতার খসড়া পাওয়া গেছে। এই বিবেচনায় কানাই সামন্ত মনে করেন যে 'শ্রাদ্ধ'র ৩০ পঙ্‌ক্তির প্রথম পাঠটি ২৮ জানুয়ারির পরবর্তী সময়ের রচনা। কানাই সামন্ত যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বলা যায়, এটি পরবর্তী ৩ সপ্তাহে ৪-৫ বার পরিমার্জন-পরিবর্ধন হয়েছে (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬: ৬৬):

> অন্য পাণ্ডুলিপিতে (অভিজ্ঞান সংখ্যা ১৬৬) কবি ইহার পরিবর্ধিত পাঠ স্বহস্তে লেখেন ৯২ ছত্রে। শ্রাদ্ধের ঐ পরিণত রূপ প্রকাশ-যোগ্য বিবেচনায় উহার নকল করা হইলে তাহাতে সুস্পষ্ট স্থান-কালের নির্দেশ: উদয়ন, ১১/২/৪০। কিন্তু পরিবর্ধনের ও পরিবর্তনের অন্ত হয় নাই তখনো। রবীন্দ্র সদনে আল্‌গা পাণ্ডুলিপিগুচ্ছে পরিবর্তিত (অব্যবহৃত) তৃতীয় যে নকল পাওয়া যায় তাহার তারিখ '১৩/২/৪০', ছত্রসংখ্যা ৯৬। এই নকলেই প্রচুর পরিবর্তন না করিয়া (নকলের উপরেই করা হইয়াছে অল্প) রবীন্দ্রনাথ নকলের শেষ পাতা স্বহস্তে পুনরায় লিখিয়া দেন, ফলে ধুয়া বাদে শেষ স্তবকের অন্যত্র অনেক বদল হয় এবং ১০ ছত্র বাড়িয়া যায়। এই প্রায় 'শেষ' পাঠ ১৬৬-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে অনুলিপিকার পুনশ্চ নকল করিয়া শেষে লিখিয়া রাখেন: উদয়ন, ১৭/২/৪০ (প্রবাসীতে ১৬ তারিখের উল্লেখ আছে)। ১০৬ ছত্রের এই পাঠে আর অধিক পরিবর্তন হয় নাই, অর্থাৎ ছত্রবিশেষ বাতিল করা হইয়াছে বা যোগ করা হইয়াছে এমন বলা যায় না।

এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করে 'শ্রাদ্ধ'র বিভিন্ন পাঠ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ক্রম পাওয়া যায়:

ক. এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় ১৬০ সংখ্যক গুচ্ছে; ৩০ ছত্রের এই পাঠ ১৯৪০-এর ২৮ জানুয়ারির পরবর্তী-সন্নিহিত সময়ে লিখিত;

খ. ১৬৬ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিগুচ্ছে দেখা যায় কবি স্বহস্তে এর দ্বিতীয় পাঠ তৈরি করেছেন; এর ছত্রসংখ্যা ৯২;

গ. উদয়নে বসে এর একটি নকল তৈরি করা হয় ১৯৪০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি;

ঘ. তৎকালে রবীন্দ্র সদনে আলগা পাণ্ডুলিপিগুচ্ছে ৯৬ ছত্রের একটি পাঠ পাওয়া গেছে। একই বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিত এই পাঠের প্রসঙ্গে কানাই সামন্তর মন্তব্য 'পরিবর্তিত' (অব্যবহৃত)!

ঙ. উল্লেখিত ১৬৬ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিগুচ্ছের নকলের ওপর সামান্য পরিবর্তন করে কবি এর শেষপাতা কেটে দেন এবং শুধু ধুয়ার অংশটি অপরিবর্তিত রেখে শেষ স্তবকে ব্যাপক পরিবর্তন করেন; ফলে এর ছত্রসংখ্যায় ১০ পঙ্‌ক্তি বেড়ে যায়;

চ. কবির এই কাটাকুটির পর পুরো রচনাটি নকল করেন অনুলিপিকার; এর নিচে লেখা উদয়ন, ১৭/২/৪০; গ্রন্থে রচনাটির নিচে এই তারিখটিই মুদ্রিত আছে।

১৬৬ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিগুচ্ছে ১১ ফেব্রুয়ারি করা নকলের ওপর কবি যে ২০ ছত্র স্বহস্তে যুক্ত করেন, তাতে স্পষ্ট যে তিনি এখানে ছড়াটি সমাপ্ত করতে চেয়েছিলেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬: ৬৬-৬৭)—

এখন তবে সাঙ্গ করো শ্রাদ্ধের এই ছড়া
হজম করার পর্ব শেষে আবার হবে পড়া। ...
... বয়স আমার শেষের কোঠায়, যদি নতুন চালে
মাঝে মাঝে ছাড়চিঠি পাই বর্তমানের কালে,
নতুন যুগের আমেজখানা লাগবে আমার হাড়ে
এই ছলনায় কোনোমতে আয়ু আমার বাড়ে ...।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ওই ২০ ছত্রের মধ্যে মাত্র ৩টি পঙ্‌ক্তি—৫, ১৩ ও ১৪—সামান্য পরিবর্তিত আকারে চূড়ান্ত পাঠে স্থান পেয়েছে। কিন্তু কৌতূহলের বিষয়, পাণ্ডুলিপিতে কবি ওই ২০ ছত্র কেটে দিয়ে স্বহস্তে নতুন করে ৮টি ছত্র লিখেছেন। এর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি—

আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে
আমরা থাকি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের দেশে।

এর পরের ৮ পঙ্‌ক্তিতে পাই লোকছড়ার সুপরিচিত অনুষঙ্গ—লাল গামছা দিয়ে টিয়ের বিয়ে, দু পণ কড়ি গুনা, ঘুমের মধ্যে বর্গীর উপদ্রব, তিনকন্যে দান প্রভৃতি। কিন্তু এই ৮ পঙ্‌ক্তির

কোনোটিই চূড়ান্ত পাঠে স্থান পায়নি। তবে চূড়ান্ত পাঠের ৮৩, ৮৪ ও ৮৫ পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখিত ২০ ছত্রের ৮৩ ও ৮৪ সংখ্যক পঙ্‌ক্তি এবং ১০ ছত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মিশ্রণ আছে।

কিন্তু পরিবর্তন এখানেই সমাপ্তি হয়নি। 'শেষ স্তবকসহ এই পাঠের পুনর্লিপি প্রস্তুত' হলে কবি এর সঙ্গে আরো ১৪ ছত্র যুক্ত করেন। চূড়ান্ত পাঠে 'আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ...' থেকে শেষ ১৪ ছত্রই এই ছত্র। এটিই (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬: ৬৮)—

> প্রবাসী-ধৃত বা ছড়ায় মুদ্রিত 'শ্রাদ্ধ' কবিতার অন্তিম চতুর্দশ ছত্রের আদর্শ-স্বরূপ। ইহারই নকলে তারিখ দেওয়া আছে '১৩/২/৪০' এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে, এবার এই তৃতীয় নকলের উপর অধিক লেখাজোখা না করিয়া উহার শেষ পাতার পরিবর্তিত পাঠ রবীন্দ্রনাথ পৃথক কাগজে লিখিয়া দিলেন। ফলে, ইতঃপূর্বে যে ৮ ছত্র সংকলন করা হইয়াছে ('আমার ছড়া চলেছে আজ ... নয়কো অসম্ভব।') তাহা ১৮ ছত্রে পরিণত হইল; ইহাই এ কবিতার শেষ স্তবকের ছত্র ১-১৮। আগের চতুর্দশ (শেষাংশ), এখনকার অষ্টাদশ (সূচনাংশ), উভয় মিলাইয়া ধুয়া-সমেত শেষ স্তবকের এই যে আদর্শ পাওয়া গেল তাহার তারিখ দেওয়া হইল '১৭/২/৪০' (পাণ্ডু. ১৬৬-ভুক্ত অন্যের নকলে), অতঃপর লেখায় ও ছাপায় অধিক তফাত হইল না। প্রত্যেক পদের বা অক্ষরের বিচার করিলে, তফাত তবু আছে।

কানাই সামন্ত আরো দেখিয়েছেন যে (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬: ৬৮) 'শ্রাদ্ধ'র *প্রবাসীতে* ধৃত পাঠের সঙ্গে গ্রন্থের চূড়ান্ত পাঠের মধ্যে অন্তত ১৪টি শব্দের পাঠভেদ আছে।

'প্রবেশক' রচনাটি *ছড়ার* রচনাগুলোর মধ্যে সব শেষে লেখা। রবীন্দ্র সদনের একাধিক পাণ্ডুলিপি এবং টাইপ-কপিতে যে পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায়, *শনিবারের চিঠির* ২ পঙ্‌ক্তি তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। কিন্তু গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির সময় এর প্রথমদিকের ৪ পঙ্‌ক্তি এবং একেবারে শেষদিকের ৮ পঙ্‌ক্তি বর্জিত হয়েছে। একইভাবে চতুর্থ ছড়ারও ২ পঙ্‌ক্তি বর্জনের উদাহরণ রয়েছে (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬: ৬৮-৬৯)।

অনুত্তম ভট্টাচার্য (২০০৩: ৫০৯) বর্তমানে রবীন্দ্র ভবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত নিম্নোক্ত পাণ্ডুলিপিগুলোতে *ছড়ার* পাণ্ডুলিপি রয়েছে বলে দাবি করেছেন—৩০১, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪২, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৭২, ১৫৯, ১৬০, ১৬৬, ২১১ ডি, ১৬১, ১৬৭, ১৮৩, ১৮৬ ও ২০৭-এ। পরে তিনি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে ১৫৯ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে ৩ সংখ্যক ছড়া; ১৬০-এ ৬; ১৬১-তে প্রবেশক রচনা; ১৬৬-তে ৬; ১৬৭-তে ২, ৬ ও ৯; ১৮৩-তে ২; ২০৭-এ প্রবেশক; ২১১-তে ৭; ৩৪১-এ ৩ এবং ছড়াগুচ্ছে প্রবেশক, ৫, ৯ ও ১১ সংখ্যক রচনার পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির তথ্য দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে যে, অনুত্তম ভট্টাচার্য 'প্রবেশক' ও ৬ সংখ্যক ছড়ার ৩টি পাঠ; ২, ৩ ও ৯ সংখ্যক ছড়ার ২টি করে পাঠ এবং ৫, ৭ ও ১১ সংখ্যক ছড়ার ১টি করে পাঠ পেয়েছেন। ১, ৪, ৮ ও ১০ সংখ্যক ছড়ার কোনো পাণ্ডুলিপি তিনি পাননি। অন্যদিকে তাঁর প্রথম তালিকার ১৮৬, ৩০১, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪২, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৫৭ ও ৩৭২ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিগুচ্ছে ছড়ার কোনো পাণ্ডুলিপির কথা তিনি উল্লেখ করেননি। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, তিনি ছড়ার পাণ্ডুলিপি-পরিচিতি ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূলত কানাই সামন্তকে অনুসরণ করেছেন।

রবীন্দ্র ভবনে বর্তমানে ডিজিটাল-সংরক্ষণের যে তালিকা রয়েছে তাতে এই ফাইলগুলোতে *ছড়ার* বিভিন্ন রচনার পাণ্ডুলিপি আছে বলে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে: ১৬০, ১৬১, ১৬৬, ১৬৭, ১৮৩, ১৮৬, ২০৭, ২১১। এর মধ্যে ১৮৬ সংখ্যক ফাইলটি আমরা দেখতে পারিনি।

১৬০ নম্বর ফাইলের ১০২ উপ-অংশে ৮, ৬ ও ৪ সংখ্যক ছড়ার পাণ্ডুলিপি আছে। এর মধ্যে ৬ সংখ্যক ছড়ার বিভিন্ন চরণের মধ্যে মূল লেখার মাঝে মাঝে 'ইনসারট' করে চরণ, এমনকি কয়েকটি স্তবক যুক্ত করা হয়েছে। ফাইলের ১১৫ সংখ্যক উপ-অংশে ৩, ১ ও ১০ সংখ্যক ছড়ার পাণ্ডুলিপি আছে। পুরো ১৬০ নম্বর ফাইলটি ১৯৩৯ সালের একটি ডায়েরির মধ্যে লেখা। এতে প্রত্যেক পাতার শীর্ষে পৃষ্ঠাঙ্ক, বড় হরফে ইংরেজি সাল এবং তার নিচে ছোট হরফে ফসলি সন, বৌদ্ধ সম্বৎ ও বাংলা সন এবং আরবি মাস চিহ্নিত। ডায়েরির মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্কের ওপরে হাতে ইংরেজি হরফে পৃথক পৃষ্ঠাঙ্ক রয়েছে; এটিই পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক বলে মনে হয়। ওই ডায়েরির একটি পাতায় নিম্নোক্ত ছড়াটি লিপিবদ্ধ আছে—

নরেশ দেখালে বটে
    জোর তব কবজির
বড় বড় ঝুড়িগুলো
    ফলমূল সবজির
পৌঁছিয়ে দিল দ্বারে
    ব্যাপারটা সোজা নয়
যে সে নেবে কাঁধে তুলে
    এমন সে বোঝা নয় ...

৩৩ খণ্ডের *রবীন্দ্র রচনাবলী*তে আমরা এর কোনো পঙ্‌ক্তি খুঁজে পাইনি। তা হলে এটি কি কবির অপ্রকাশিত কোনো রচনা?

১৬৬ নম্বর ফাইলে বেশ কিছু লেখার নকল আছে। তবে আমাদের পর্যবেক্ষণের সময়ে উপস্থিত রবীন্দ্র ভবনের কয়েকজন প্রবীণ কর্মীর মতে এগুলো কবির হস্তাক্ষর নয়; অন্যের হস্তাক্ষরে নকল। এই ফাইলে ৬ সংখ্যক ছড়ার একটি নকল আছে।

১৮৩ নম্বর ফাইলে ১ ও ২ সংখ্যক ছড়ার পাণ্ডুলিপি রয়েছে। দুটো ছড়াতেই কাটাকুটি প্রচুর। ১ সংখ্যক ছড়ার যে পাণ্ডুলিপি এই ফাইলে আছে তা *শনিবারের চিঠি*তে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত ওই ছড়ার থেকে ভিন্ন পাঠ।

১৬১ নম্বর ফাইলটি ১৯৪০ সালের একটি ডায়েরির পাতায় লেখা। এই ফাইলে আমরা *ছড়ার* কোনো রচনা খুঁজে পাইনি। তবে 'যার যত নাম আছে সব গড়াপেটা ...' শীর্ষক একটি ছড়া রয়েছে। এই দীর্ঘ ছড়াটি *গল্পসল্প*র 'বাচস্পতি' শীর্ষক গল্পের ক্রমধারায় মুদ্রিত; এর রচনাকাল ৯ মার্চ ১৯৪১।

২০৭ নম্বর ফাইলে প্রবেশক রচনাটির এবং ২১১ ডি ফাইলে ৭ সংখ্যক ছড়ার পাণ্ডুলিপি আছে। এই তালিকাকে সমন্বিত করলে বলা যায়, মোট ৭টি ফাইলে (১৬০, ১৬১, ১৬৬,

১৬৭, ১৮৩, ২০৭ ও ২১১ ডি) প্রবেশক, ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮ ও ১০ সংখ্যক ছড়ার পাণ্ডুলিপি আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছি; ৫, ৯ ও ১১ সংখ্যক ছড়ার পাণ্ডুলিপি আমরা পাইনি। আবার প্রথম ছড়াটির দুটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে।

১৬০ নম্বর ফাইলের ১১৫ উপ-অংশে মুদ্রিত ৮০ ও ৮১ এবং তার ওপরে পেনসিলের লেখায় ৭৭ ও ৭৮ পত্রাঙ্কিত পৃষ্ঠায় তৃতীয় ছড়াটির পাশাপাশি দুটি পাঠ রয়েছে। দুটি পাঠেই ১৮টি করে ছত্র রয়েছে। তবে বাঁ দিকের পাতায় প্রতিটি পঙ্‌ক্তি ১০ মাত্রার; আর ডান দিকের পাতায় অধিকাংশ ১৪ মাত্রার। কবি প্রথম পাঠটিতে কিছু শব্দ যোগ করে একটি মানুষের ফিগার দিয়ে ডুডল করেছেন। ডানের পাতায় আবার দীর্ঘতর পঙ্‌ক্তির পাঠটি লিখেছেন। দুটো পাঠের প্রথম ৬ পঙ্‌ক্তিকে এভাবে তুলনা করা যেতে পারে—

প্রথম পাঠ	**দ্বিতীয় পাঠে যোগ/পরিবর্তন**
ঝিনেদার ^ বঙ্কিম রায়রা	জমিদার
পুষেছিল ^ একপাল পায়রা—	সে বছরে
^ বাবু খাটিয়ায় বসে ^ পান খায়	বড়ো/ বসে
পায়রা আঙিনা জুড়ে ^ ধান খায়	খুঁটে খুঁটে
^ হেলে দুলে চলে বাঁকা রকমে	খাটো পায়ে
^ বকাবকি করে বকবকমে।	ঘাড় নেড়ে

ছড়ায় মুদ্রিত পাঠে আবার ছোট-বড় বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন, পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণের দ্বিতীয় পাঠ:

খাটো পায়ে হেলে দুলে চলে বাঁকারকমে
ঘাড় নেড়ে বকাবকি করে বকবকমে।

মুদ্রিত পাঠ:

হাঁসগুলো জলে চলে আঁকা-বাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্-বক্-বকমে।

দ্বিতীয় পাঠ এবং মুদ্রিত পাঠে উল্লিখিত ৬ ছত্র নিয়েই প্রথম স্তবক। দ্বিতীয় পাঠে এর পরের স্তবকে পাওয়া যায় গোপালন নিয়ে কৌতুককর ঘটনা যাতে মাস্টারদের ছাত্রপীড়ন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরক্তি প্রত্যক্ষভাবেই প্রকাশিত—

হেনকালে শোনা গেল গুজরানওয়ালায়
জোট করে দলে দলে পাঞ্জাবি গোয়ালায়।
বলে ওই নির্বোধ গোরু পোষা কারবার
প্রগতির যুগে আজ দিন এল ছাড়বার।
আজ থেকে প্রত্যহ রাত্তির পোয়ালেই
বসবে সেকেন্ড ক্লাস সারে সারে গোয়ালেই।

রাশি রাশি জমা করা খড়ভুষি ঘাসটার
ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইস্কুল মাষ্টার।
যত অভ্যেস আছে ল্যাজ মলে পিটোনো
ছেলেদের পিঠে হবে পেট ভরে মিটোনো।
ল্যাজ যদি কোনোখানে খুঁজে নাহি পায় তো
কান দুটো আছে তবু ভুল নেই তায় তো। ...

আশ্চর্যের বিষয়, মুদ্রিত পাঠে তৃতীয় ছড়ায় এই ঘটনার কোনো অস্তিত্বই নেই। তাতে পাওয়া যায় ঘুড়ি কাটাকাটি নিয়ে দুই দলে দ্বন্দ্ব, উভয়পক্ষে পেশিশক্তির ব্যবহার, এরপর গুজব ও সংবাদপত্রে পরস্পরবিরোধী খবর, সেই দ্বন্দ্ব বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া, হাওড়া স্টেশনে দুই সম্পাদকের মুখোমুখি সংঘাত ইত্যাদি। অন্যদিকে উল্লিখিত ১২ ছত্রের ১০ ছত্র পাওয়া যায় *ছড়া*র ৯ নম্বর রচনায়; তবে এতে বেশ কিছু পরিবর্তন আছে। যেমন পূর্বোক্ত স্তবকের—

৩ নম্বর ছড়ার দ্বিতীয় পাঠ	**মুদ্রিত ৯ নম্বর ছড়ার পাঠ**
হেনকালে শোনা গেল গুজরানওয়ালায়	‘বার্তাকু’ লিখে দিল—‘গুজরানওয়ালায়
বলে এই নির্বোধ গোরু পোষা কারবার	বলে তারা, গোরু পোষা গ্রাম্য এ কারবার
বসবে সেকেন্ড ক্লাস সারি সারি গোয়ালেই	বসবে প্রিপারেটরি ক্লাস এই গোয়ালেই
রাশি রাশি জমা করা খড়ভুষি ঘাসটার	স্তূপ রচা দুই বেলা খড়ভূষি-ঘাসটার

দেখা যায় যে, *ছড়া*র ৯ নম্বর রচনাটির কাহিনি-সংস্থান ওই ঘটনারই ধারাবাহিকতা। ইতিপূর্বে আমরা যেমন একটি পাণ্ডুলিপির পাঠ থেকে (‘চলচ্চিত্র’) দ্বিতীয় ও পঞ্চম ছড়ার বিকাশ দেখেছি, একইভাবে এখানে একই পাণ্ডুলিপি-পাঠ থেকে তৃতীয় ও নবম ছড়ার বিকাশ দেখতে পাই।

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, ‘শ্রাদ্ধ’র প্রথম পূর্বপাঠের ৪টি পঙ্‌ক্তি চূড়ান্তপাঠে ব্যবহার হয়নি। এর দুটি পঙ্‌ক্তি—

জামাইবাবু হুকুম করেন বিয়ে বাড়ির তোল্ মাল
তাই নিয়ে সব পাইকগুলো লাগায় বিষম গোলমাল।

আশ্চর্যজনকভাবে এই দুটো পঙ্‌ক্তি পরিবর্তিত আকারে পাওয়া গেল তৃতীয় ছড়ায়—

শুধু কুলি চার জন করেছিল গোলমাল,
লাল-পাগড়ি সে এসে বলেছিল ‘তোল্ মাল’।

এই উপ-অধ্যায়ের আলোচনা থেকে বলা যায়, *ছড়া*র রচনাগুলো অনায়াসসাধ্য লেখা নয়। বারবার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুলো চূড়ান্তরূপে এসে মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেন শব্দ ও পঙ্‌ক্তি নিয়ে খেলা করছেন। ফলে তৈরি হয়েছে বহু সংখ্যক পাঠ-পাঠান্তর। এক খসড়া থেকে তৈরি হয়েছে একাধিক ছড়া; যেন গণিতের ‘পারমুটেশন-কম্বিনেশন’। উল্লেখ্য,

প্রবেশকসহ ১২টি ছড়ার মধ্যে ৭টির পাণ্ডুলিপি এই বিবেচনায় আনা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টির পাণ্ডুলিপি বিবেচনা করতে পারলে আরো কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া যেত বলে আমাদের ধারণা।

তিন

রচনাসংখ্যা বিচারে *ছড়া* রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্রতম গ্রন্থ। এর রচনার সংখ্যা ১১; গ্রন্থের পাঠে রচনাগুলোর শিরোনাম সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত। 'প্রবেশক'সহ ১২টি রচনার মোট পঙ্‌ক্তি সংখ্যা অনধিক ৮০০। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে ভাবপ্রকাশের জন্য এই সংখ্যা অপর্যাপ্ত নয়। অথচ *ছড়ায়* সুসঙ্গত অর্থবোধক ভাব অতি সামান্য। এর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় শুদ্ধসত্ত্ব বসুর (১৪০৬: ৪২৪-২৬) বিশ্লেষণে—

> ছড়ার মধ্যে ভাবের গুরুত্ব নেই, কথার চাতুরী এবং শব্দ নিয়ে খেলা। কল্পনার লঘুপক্ষ মেলে কবি বিচরণ করেছেন কখনো আজগুবি ভাবের আকাশে, আবার কখনো বা চেনার জগতে একেবারে অচেনার মনোভাব নিয়ে; তাই ছড়ায় তিনি যে-কথা বলেছেন—তাতে কবির কোনো দায়ভাগ নেই, শুধু আনন্দরস বিতরণের জন্যেই তার আবেগ বল্গামুক্ত অশ্বের মতো এলোমেলো পথে ছুটে চলেছে ...
>
> বিচ্ছিন্ন বিষয়বস্তু থেকে কোনো জাতের কাব্যেরই পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, তার চেয়ে কাব্যের প্রাণরূপকে তার স্বকীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে দেখার শক্তি অর্জন করতে হয়; বিশেষ করে ছড়া জাতীয় বা ননসেন্সভার্স সম্পর্কে এ কথা খুবই খাঁটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও ছড়ার মধ্যে অর্থ বা ভাব খোঁজার বিপদ সম্পর্কে বারবার সাবধান করেছেন। *ছড়ার* 'প্রবেশক' রচনায়ও তিনি বলেছেন—

> এলোমেলো ছিন্নচেতন/ টুকরো কথার ঝাঁক
> জানি নে কোন্ স্বপ্নরাজের/ শুনতে সে পায় ডাক ...
> ... কারো আছে ভাবের অভাস/ কারো বা নেই অর্থ। ...
> ... বাইরে থেকে দেখি একটা/ নিয়ম ঘেরা মানে,
> ভিতরে তার রহস্য কী/ কেউ তা নাহি জানে। ...
> — বাঁধনটাকেই অর্থ বলি,/ বাঁধন ছিঁড়লে তারা
> কেবল পাগল বস্তুর দল/ শূন্যেতে দিক্‌হারা।

তবে কবির নিজের এবং বিশ্লেষকদের এই অনুভব সত্ত্বেও *ছড়ায়* সমকালীন ঘটনাবলির প্রতিফলন বিরল নয়। এর মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে কবির প্রতিক্রিয়া।

যুদ্ধ নিয়ে প্রত্যক্ষ মন্তব্য পাওয়া যায় *ছড়ার* ৬ সংখ্যক রচনায়। এর রচনাকাল ১৯৪০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। এর ৪ মাস আগে জার্মানি পোল্যান্ড দখল করে নিয়েছে; উত্তর ইউরোপে অগ্রসর হচ্ছে একদিকে জার্মান, অন্যদিকে সোভিয়েত সেনা। জার্মানি ও ইতালির মিলিত

আগ্রাসনে ফ্রান্সসহ পশ্চিম ইউরোপ পতনের মুখে। উল্লেখিত ছড়ার ১০৬ পঙ্‌ক্তির মধ্যে মাত্র ১৪টি পঙ্‌ক্তিতে কবি অঙ্কন করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চিত্র—

> ওই শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি;
> দেশ-বিদেশে শহর-গ্রামে গলা-কাটার ধুম কী। ...
> ... রেডিয়োতে খবর জানায়, বোমায় করলে ফুটো—
> সমুদ্দুরে তলিয়ে গেল মালের জাহাজ দুটো। ...
> আকাশ থেকে নামলো বোমা, রেডিয়ো তাই জানায়—
> আপঘাতে বসুন্ধরা ভরল কানায় কানায়।
> ... গ্যাঁ গোঁ করে রেডিয়োটা—কে জানে কার জিত,
> মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত। ...

এই বিবরণে হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণা, নৃশংসভাবে নরহত্যা, ভূমধ্যসাগরে মালবাহী জাহাজে বোমারু বিমানের আক্রমণ, যুদ্ধক্ষেত্রে মেশিনগানের ব্যাপক ব্যবহার প্রভৃতি চিত্র প্রত্যক্ষ।

উল্লেখ্য, হিটলার জার্মানির কর্তৃত্ব গ্রহণের পর কবি ১৯২৫-২৬ সালে জার্মানির বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করেছেন। এর আগে সাক্ষাৎ করেছেন হিটলারের মিত্র ইতালির মুসোলিনির সঙ্গে। মুসোলিনির প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক সমর্থন সে সময়ে অনেককে বিস্মিত করেছিল। পরে রোমা রোলাঁসহ পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলাপের পর কবির ভুল ভাঙে। প্রকাশ্যেই তিনি জাপান-জার্মান আগ্রাসনের নিন্দা করেন। ১৯৪০-এর প্রথম দিকে রচিত এই ছড়ায় কবির ফ্যাসিবাদবিরোধী মনোভাব স্পষ্ট। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর (১৩৪৯: ৩৮) বরাতে জানা যায়, ‘এই সময় প্রতিদিন তিনি যুদ্ধের খবর নিতেন।’

এই ভয়াবহ ধ্বংস ও নৃশংসতার শেষ কোথায়, যুদ্ধেরই-বা পরিণতি কী—সচেতন বিশ্ববাসীর অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথের মনেও এই প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। উল্লেখিত ছড়ার শেষ পঙ্‌ক্তিগুলোতে তাই কবির পর্যবেক্ষণ—

> সিন্ধুপারে চলছে হোথায় উলট-পালট কাণ্ড,
> হাড় গুঁড়িয়ে বানিয়ে দিলে নতুন কী ব্রহ্মাণ্ড।
> সত্য সেথায় দারুণ সত্য, মিথ্যে ভীষণ মিথ্যে,
> ভালোয় মন্দে সুরাসুরের ধাক্কা লাগায় চিত্তে।
> পা ফেলতে না ফেলতেই হতেছে ক্রোশ পার।
> দেখতে দেখতে কখন যে হয় এস্‌পার-ওস্‌পার ৎ

*ছড়া*র আর একটি রচনায় মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়; রচনাকাল ১৫ মে ১৯৪০। যুদ্ধক্ষেত্রে এ সময়ে জার্মানির হাতে ফ্রান্সের পরাজয় অবধারিত, পশ্চিমের দিকে ছুটে যাচ্ছে হিটলার-মুসোলিনির সেনাদল। এদিকে আলোচনা চলছে ভারতবর্ষ কীভাবে ইংরেজদের সাহায্য করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন (ছড়া ১)—

> পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীর পুরুষের বড়াই,
> সমুদ্দুরের এ পারেতে এ’কেই বলে লড়াই।

সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, *রবীন্দ্র রচনাবলীর* গ্রন্থপরিচয়ে *ছড়ার* 'প্রবেশক' রচনার বর্জিত ৬টি পঙ্‌ক্তির সন্ধান দিয়েছেন কানাই সামন্ত, তার মধ্যেও চলমান যুদ্ধে ধ্বংসের প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে—

মানুষ করে হানাহানি/এ ওর ঘাড়ে পড়ে। ...
যুগান্ত যেই মেলবে কেবল/ঢুকবে বিরাট ফাঁকে,
কোথাও কিছু রবে কিনা/প্রশ্ন করব কাকে।

যুদ্ধের বিভীষিকা নিয়ে *জন্মদিনের* ২১ নম্বর কবিতাটি লিখেছিলেন কালিম্পঙে বসে, রচনাকাল ২২ মে ১৯৪০; পূর্বে উল্লেখিত ছড়ার প্রথম রচনাটি এর এক সপ্তাহ আগে ওই কালিম্পঙে বসেই লেখা। *জন্মদিনের* ওই কবিতায় লিখছেন—

রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগরগ্রামের
অস্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
বন্যা নামে যমলোক হতে,
রাজ্যসাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে। ...
... সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো,
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্বা সেই কুকুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মাপর;
আদিম বন্যতা তার উদ্‌বারিয়া উদ্দাম নগর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা ছিন্ন করে; ...

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতি দেখে যেতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। তবে যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরেই ধ্বংস এবং নরহত্যার যে ভয়াবহ রূপ তাই তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ১৯৪০-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তায় রচিত *রোগশয্যায়ের* ৩৮ সংখ্যক কবিতায় লিখছেন—

ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা।

যুদ্ধের একেবারে প্রথম দিকে জাপান যখন চীন আক্রমণ করে তখন এক জাপানি সৈনিক যুদ্ধে সাফল্য কামনায় বৌদ্ধমন্দিরে প্রার্থনা করেছিল। খবরটি জানাজানি হলে কবি ক্ষুব্ধ হয়ে 'বুদ্ধভক্তি' নামে যে কবিতা রচনা করেন (৯ জানুয়ারি ১৯৩৮) তার ওপরে লেখেন: 'ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে ...'।

কিন্তু এই নির্মমতার মধ্যেও কবি ভুলে যাননি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। মানুষের মধ্যে যে মঙ্গলময় সত্তা আছে, কবি আস্থা রেখেছেন তার ওপরেই। এর একটি প্রকাশ দেখা যায় অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে কথোপকথনে (অনুত্তম ২০০৩: ৫১৬):

> মানুষকে মানুষ মারছে পশুর মতো, কী ভয়ংকর নির্মমতা। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার দেখো, একদল মানুষ এই সব দুঃখ কী তীব্রভাবে অনুভব করছে অন্তরে। এই যে তোমার মনে আমার মনে বাজছে—আরো কত লোকের মনে ব্যথা বাজছে—এর কারণ কী? আমার মনে এর একটা গূঢ় কারণের সন্ধান পাই। ... আমার চিন্তায় এবং অনুভূতিতে টের পাই—একটা বিরাট মানব-সত্তা আছে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে জুড়ে, যে-সত্তার মধ্যে ক্রমাগত চলেছে একটা ভালোর তপস্যা।
>
> সকলের মধ্যে একটা সাধারণ ভালোর জন্য একটা তাগিদ আছে, সকলের মধ্যেই অকল্যাণের বিরুদ্ধে কমবেশি প্রতিবাদ আছে। ...

কিন্তু মানুষের ওপর বিশ্বাস না হারালেও রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সভ্যতার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। জীবনের শেষ জন্মদিন উদ্‌যাপনে (১ বৈশাখ ১৩৪৮) 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক ভাষণে কবি অনুভব করেন (রবীন্দ্রনাথ ১৪১৬ক: ৬৪০):

> সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। ...
>
> ... জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।

*ছড়া*র অন্তত দুটি রচনার মধ্যে দেশীয় রাজনীতি নিয়ে কটাক্ষ আছে এমনটি মনে করেন কোনো কোনো বিশ্লেষক। জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪০১: ২১৪-১৫) মনে করেন, প্রথম রচনাটিতে 'সমসাময়িক দেশীয় রাজনীতির উপর কটাক্ষ আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়'; তবে তিনি স্বীকার করেন যে এই বিষয়টি 'ব্যাখ্যা করিয়া স্পষ্ট করা কঠিন'। শুদ্ধসত্ত্ব বসুও (১৪০৬: ৪২৫) মনে করেন 'ছড়াটির মধ্যে দেশের রাজনীতি ... নিয়ে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রয়েছে'। নেপাল মজুমদারও (১৯৯৬: ২০৫) মনে করেন ওটি 'সমসাময়িক রাজনৈতিক দলগুলোর নোংরা পলিটিক্‌সকারীদের উদ্দেশ্যে' রচিত।

প্রভাতকুমার এ প্রসঙ্গে ছড়াটির যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন তাতে ভারতীয়দের নতজানু ভাব এবং গুজব ছড়ানোর প্রসঙ্গ আছে। মিথ্যা তর্ক এবং গুজব থেকে যে সংঘাত হচ্ছিল, তাও উঠে এসেছে উল্লেখিত রচনাটিতে—

> এর পরে দুই দলে মিলে ইট-পাটকেল ছোঁড়া,
চক্ষে দেখায় সর্ষের ফুল, কেউ বা হল খোঁড়া—

ছড়াটির মধ্যে দেখা যায়, 'রামছাগলের ঘাড়ে ... বাঁদর চড়ে বসে আছে' এবং কাতলা মাছ 'লেজের ঝাপট' মারছে। এর মধ্যে কি কংগ্রেসের নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব নিয়ে কোনো ইঙ্গিত আছে? অথবা বাঁদর, রামছাগল বা কাতলা মাছ দিয়ে কি কবি কোনো চরিত্রকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন?

তৃতীয় ছড়াটির মধ্যে অবশ্য রাজনীতির নানা অনুষঙ্গ প্রত্যক্ষ। ঘুড়ি কাটাকাটি নিয়ে দুই দলের মারামারি, গুজবে সংঘাত বৃদ্ধি এবং তাতে সংবাদপত্রের অপভূমিকা, সবজির বাজারে মস্তানি ইত্যাদি প্রসঙ্গ থেকে কবি উত্থাপন করলেন ইংরেজ-সরকারের সেন্‌সরশিপ এবং পার্লামেন্টের সামনে তথ্য গোপনের গুরতর বিষয়—

এ খবর একেবারে লুকোনোই দরকার,
গাপ করে দিল তাই ইংরেজ সরকার।
ভয় ছিল কোনোদিন প্রশ্নের ধাক্কায়
পার্লিয়ামেন্টের হাওয়া পাছে পাক খায়।

এরই সূত্র ধরে কবি আবার উত্থাপন করেন সংবাদপত্রে পুলিশের সমালোচনা, পুলিশের সতর্ক পদক্ষেপ এবং সমস্ত ঘটনার জন্য কংগ্রেসের ওপর দায় চাপানো—

এডিটর বলে, এতে পুলিসের গাফেলি;
পুলিশ বলে যে, চলো বুঝেসুঝে পা ফেলি।
ভাঙল কপাল যত কপালেরই দোষ সে,
এ-সব ফসল ফলে কন্‌গ্রেসী শস্যে।

এই ছড়ার মধ্যেই পাওয়া যায় দালাল দিয়ে সভা ভাঙানো, সভা-সমিতির নামে চাঁদা তুলে অর্থ আত্মসাৎ প্রভৃতি।

ছড়ায় আরো একটি বিষয় খুব বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়—মামলা। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের আগে পর্যন্ত বিচারের প্রধান প্রক্রিয়া ছিল স্থানীয় সালিশি, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। মোগল আমলে কাজি ইত্যাদির প্রচলন হলেও বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ পল্লি অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল না। ইংরেজ আমলে বিচারক, পেশকার, উকিল, মোক্তার, সাক্ষীসাবুদ মিলে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠল, গরিব জনসাধারণের জন্য তা ছিল ব্যয়বহুল। অন্যদিকে মোক্তার-উকিল মিলে মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করে এবং অন্যান্য উপায়ে যে চক্র গড়ে তুলত তাতে অনেক সময় সত্যিকার অপরাধী শাস্তি থেকে বেঁচে যেত এবং ভুক্তভোগী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতো। পাশাপাশি ক্রোকসহ নানা শাস্তি ছিল হয়রানি ও নিপীড়নমূলক। *ছড়ার* একাধিক রচনায় এই চিত্র পাওয়া যায়।

ছড়ার চতুর্থ রচনার পুরো ঘটনা-সংস্থানই মামলা ও বিচার নিয়ে। সম্ভ্রান্ত মির্জা বংশের দুই ভাই সাহেব আলী ও জোনাব আলী (পাঠে সাহেবালি ও জোনাবালি) এক কাবুলি বিড়াল নিয়ে বিবাদে জড়িয়েছে। দুই দিকে নিযুক্ত মোক্তাররা কোমর বেঁধে মামলায় মেতেছে। এই বিবাদের কারণ অস্পষ্ট—তর্ক চলছে বিড়ালের লেজ, গোঁফ, নখ এমনকি আওয়াজ নিয়ে। ফলে—

> সাক্ষীর ভিড় হল দলে দলে তা নিয়ে, ...
> ... জজ সা'ব কী করে যে থাকে বলো সুস্থির।

দ্রুত এ বিবাদে জড়িয়ে পড়লেন কাবুলের আমির। ভারতে আখরোট-খোবানি রফতানি বন্ধ হলো। এদিকে বেড়ালের ঠিকুজি-সন্ধান চলছে—

> ... মেসোপোটেমিয়ারই
> মার্জারগুষ্টির হবে সে কি ঝিয়ারি।
> এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরী—
> রোঁয়াতে সে ইরানী যে নাহি তাহে সংশয়,
> দাঁতে তার এসীরিয়া যখনি সে দংশয়।
> কটা চোখ দেখে বলে পণ্ডিতগণেতে,
> এখনি পাঠানো চাই wimবিল্‌ডনেতে।
> বাঙালি থিসিসওলা পড়ে গেছে ভাব্‌নায়,
> ঠিকুজি মিলবে তার চাটগাঁ কি পাবনায়।

ওদিকে আর্মানি গির্জার পাড়ায় উৎসুক জনতার 'তিল ঠাঁই নাই'। ক্যামব্রিজের পণ্ডিতরা এ নিয়ে গবেষণা শুরু করল। লেজ গেল 'মিউজিয়মে', গোঁফ মিউনিকে। এসব ঘটল কোন আইনে? রবীন্দ্রনাথ কটাক্ষ করছেন, 'প্রিভিকৌঁসিলে-দেওয়া আইনের নিয়মে'। ওদিকে—

> বিড়াল ফেরার হল, নাই নামগন্ধ—
> জজ বলে, তাই ব'লে মামলা কি বন্ধ।

জজের সঙ্গে মামলার চলমানতা নিয়ে সমান উৎসাহী উকিল, মোক্তার, পেয়াদা। মিথ্যা সাক্ষী তৈরি থামেনি। ওদিকে দুই ভাইয়ের 'বেঁচে থাকা দায়'; মামলাটা গলার ফাঁসে পরিণত হয়েছে।

১০ নম্বর ছড়ায় সিউড়ির হরেরাম মৈত্তিরের যে কাহিনি তাতে একই সঙ্গে ইংরেজ আমলের বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা প্রত্যক্ষ। মোক্তার নিয়োগের পাশাপাশি ভুয়া সাক্ষী জোগাড়ও যে মামলা চালানোর অংশে পরিণত হয়েছিল, তা স্পষ্ট—

> খুঁজে যদি পাওয়া যায় মোক্তার।
> সাক্ষীর খোঁজে গেল চেউকি,
> গাঁজাখোর আছে সেথা কেউ কি।

অষ্টম ছড়াটি পড়ে বোঝা যায়, উকিলের অর্থ জোগান দিতে মক্কেল নিঃস্ব হয়ে পড়ছে—

> এজলাসে চিন্তিত ডেপুটি। ...
> ... বলে ওঠে তিনকড়ি পোদ্দার—
> আগে তুই উকিলের শোধ ধার। ...
> ... মুনশি যখন লেখে তৌজি ...

ইংরেজদের পুরো বিচারব্যবস্থা যে ভারতবর্ষের অনুপযোগী, উকিল-মোক্তার-সাক্ষীর চক্রে অসহায় বিচারপ্রার্থীরা—কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি গোপন থাকেনি ছড়াগুলোতে। মামলার প্রসঙ্গ নিয়ে তখন যে কবিমনে নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছিল, তা অনুধাবন করা যায় *ছড়া*র অধিকাংশ রচনায় মামলা, এজলাস, আদালতের রেহাই ইত্যাদি বিষয় উত্থাপনের মধ্যে।

শুধু বিচারব্যবস্থা নয়, ইংরেজ প্রশাসনও দেশীয় মিত্রদের মাধ্যমে যেভাবে শাসন পরিচালনা করছিল তাও যে রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয়নি, *ছড়া*র বক্তব্যে তাও স্পষ্ট। ৮ নম্বর ছড়ায় কবি জানাচ্ছেন—

চৌকিদারের মেজো শালী সে
পড়ে থাকে মুখ গুঁজে বালিশে। ...
... ডেপুটির জুতো মোড়া সাটিনেই, ...
... পেয়াদা ঘি আনে তিন মটকা। ...
... উমেদার এল আজ পয়লা। ...
... তাল ঠোকে রামধন মুনশি ... ইত্যাদি।

দশম ছড়াটিতেও পাওয়া যায় একই রকমের চিত্র—

চোখ রাঙা ক'রে বলে দারোগা,
থানামে লে কর্ হম্ মারো গা। ...
... চেপে বসে ডেপুটির পেয়াদায়। ...
... দর-কষাকষি নিয়ে অবশেষ
পুলিশ-থানায় হল সব শেষ। ...
... শালা ছিল জমাদার থানাতে,
ভোজ দিল মোগলাই খানাতে,
জৌনপুরি কাবাবের গন্ধে
ভুরভুর করে সারা সন্ধে ... ইত্যাদি।

কৌতুকের ছলে এসব কটাক্ষের মধ্যে কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে ইংরেজ শাসনের এই দিকগুলোতে যে অসংগতি ছিল, তা ফুটে উঠেছে।

খাপছাড়া ও *ছড়ার ছবি*র তুলনায় *ছড়ায়* সামন্ত প্রভুদের উপস্থিতি স্বল্প। একমাত্র তৃতীয় ছড়ায় ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়দের পায়রা ও হাঁস পোষা এবং বড়বাবুর খাটিয়াতে বসে পান খাওয়ার দৃশ্যই প্রত্যক্ষ। অন্য ছড়ায় বিচ্ছিন্নভাবে জমিদারের খাজনা (৬), সেরেস্তাদার ও খাজাঞ্চি (৭) ইত্যাদি প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সারাজীবনের উদ্বেগের বিষয় তৎকালীন শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-নিপীড়ন স্থান পেয়েছে *ছড়া*র দুটো রচনায়। নবম ছড়ার শুরুতে দেখা যায় পাঞ্জাবি গোয়ালারা গরু পোষার কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। পরিবর্তে—

আজ থেকে প্রত্যহ রাত্তির পোয়ালেই
বসবে প্রিপারেটরি ক্লাস এই গোয়ালেই।
স্তূপ রচা দুই বেলা খড়ভূষি-ঘাসটার
ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইস্কুল-মাস্টার।
হম্বাধ্বনি যাহা গো-শিশু গো-বৃদ্ধের
অন্তর্‌ভূত হবে বই-গেলা বিদ্যের।
যত অভ্যেস আছে লেজ ম'লে পিটোনো
ছেলেদের পিঠে হবে পেট ভ'রে মিটোনো।

স্কুলের সঙ্গে গোয়ালের তুলনা, গোয়ালাদের স্কুল-মাস্টারে রূপান্তর, ছাত্রদের গরুর মতো করে পিটানো ইত্যাদির মধ্যে তৎকালীন শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-নিপীড়নের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে বিরক্তি ও কটাক্ষ, তা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ হয়েছে। প্রথম ছড়াটির একটি অংশেও ছাত্র-পীড়নের চিত্র আছে—

বিদ্যালয়ের মঞ্চ-'পরে টাক-পড়া শির টলে—
পিঠ পেতে দেয়, চ'ড়ে বসে টেরিকাটার দলে।
গুঁতো মেরে চালায় তারে, সেলাম করে আদায়,
একটু এদিক-ওদিক হলে বিষম দাঙ্গা বাধায়।

দশম ছড়ায় কটাক্ষ আছে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উদ্দেশে। জনৈক জামাতা নাকে মুরগির ঠোকর খেয়েছে; প্রতিকারের জন্য গাঁয়ের মোড়ল কানপুর থেকে পণ্ডিত নিয়ে এসেছে, যার মতে—

... এরে করা চাই দণ্ডিত।
লাশা হতে শ্বেত কাক খুঁজিয়া
নাসাপথে পাখা দাও গুঁজিয়া।
হাঁচি তবে হবে শত শতবার,
নাক তার শুচি হবে ততবার।

সংবাদপত্র, সাংবাদিক, বিশেষত সম্পাদকদের নিয়ে কৌতুক আছে গ্রন্থের ২টি ছড়ায়। তৃতীয় ছড়ার দ্বিতীয় স্তবক শুরুই হয়েছে এভাবে—

খবরের কাগজেতে shock দিল বক্ষে,
প্যারাগ্রাফ ঠোক্কর লাগে তার চক্ষে।

ঘটনার সূচনা পোড়াদহ অঞ্চলে 'ঘুড়ি-কাটাকাটি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি' কিন্তু—

... মনে হয় সন্ধ
পোলিটিকালের যেন পাওয়া যায় গন্ধ।

এরই সূত্র ধরে সংবাদপত্র রানাঘাট সমাচারে ছয়-সাত হাজার গুণ্ডার সবজির বাজার আক্রমণের সংবাদ তৈরি করলে সরকারের পক্ষে তা সেন্সর করা হয়। মূল ঘটনার জন্য সম্পাদক পুলিশের গাফিলতিকে দায়ী করলে পুলিশ দায় চাপায় কংগ্রেসি-রাজনীতির ওপর।

ওদিকে যশোরের সংবাদপত্রের মতে, ঘটনার সূত্রপাত বাসি সবজির ঝাঁকা থেকে চালতা ছুড়ে মারার প্রতিক্রিয়ায়। কিন্তু পূর্বোক্ত সংবাদপত্রে—

> ‘মহাকাল’ লিখেছিল, ভাষা তার শানানো,
> চালতা ছোঁড়ার কথা আগাগোড়া বানানো—
> বড়ো বড়ো লাউ নাকি ছুঁড়েছে দু পক্ষে,
> শচীবাবু দেখেছে সে আপনার চক্ষে। ...
> ... আর এক সাক্ষীর আর এক জবানি—
> বেল ছুঁড়ে মেরেছিল দেখেছে তা ভবানী।
> যার নাকে লেগেছিল সে গিয়েছে ভেবড়ে ...

প্রতিপক্ষের সম্পাদক প্রশ্ন তুললেন, যেখানে সংঘাত হয়েছে সেখানে তো কোনো বেল গাছ নেই; আর নাকে লাগলে তো নাকই ‘নাশ্য’। পরে এই ‘মিথ্যাবাদিত্ব’ আরোপের জন্য ওই সম্পাদকের প্রতি ভবানীর নিকটাত্মীয়ের রোষ—

> ... তব কলমের চালনা
> এখনি ঘুচাতে পারি, বাড়াবাড়ি ভালো না।

পরে জানা গেল সংঘাতের ঘটনাই গুজব। প্রকৃতপক্ষে—

> মাছ নিয়ে বকাবকি করেছিল জেলেটা,
> পচা কলা ছুঁড়ে তারে মেরেছিল ছেলেটা।

গ্রামের ছেলে তারিণী পুরো সংবাদের প্রতিবাদ করে সংবাদপত্রে পত্র পাঠায়। কিন্তু—

> নেহাত পারে না যারা পাবলিশ না ক’রে
> সব-শেষ পাতে দিল বর্জই আখরে।
> প্রতিবাদটুকু কোনো রেখা নাহি রেখে যায়,
> বেল থেকে তাল হয়ে গুজবটা থেকে যায়।

অনেক দিন পর দুই সম্পাদকের দেখা হাওড়া স্টেশনে রেলগাড়ির কামরায়। পুরাতন কথা বলতে বলতে শুরু হলো ‘বেল’ বনাম ‘লাউ’য়ের বিতর্ক—

> দুজনেই হয়ে ওঠে মারমুখো হন্যে। ...
> ... বাছা বাছা ইংরেজি কটুতা
> প্রকাশ করিতে থাকে দুজনের পটুতা।
> অনুচর যারা, তারা খেপে ওঠে কেউ কেউ ...

তবে গার্ড এসে ট্রেনযাত্রা বাতিল করে দিলে ঘটনার ওখানেই সমাপ্তি হয়।

নবম ছড়াটির শিরোনামেই স্পষ্ট যে, এটি সংবাদপত্র প্রসঙ্গে লেখা। *বঙ্গলক্ষ্মী*র ১৩৪৭ সনের বৈশাখ সংখ্যায় এবং পরের মাসে *প্রবাসী*র (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) ‘কষ্টিপাথর’ অংশে ছড়াটি ছাপা

হয় 'রবিবারি সংস্করণ: আজ হল রবিবার' শিরোনামে। ছড়াটির প্রথম ৪ পঙ্‌ক্তি থেকেই জানা যায়—

আজ হল রবিবার—খুব মোটা বহরের
কাগজের এডিশন; যত আছে শহরের
কানাকানি, যত আছে আজগবি সংবাদ,
যায় নিকো কোনোটার একটুও রঙ বাদ।

এই ছড়ার বিষয়বস্তুও দুটি সংবাদপত্রের মধ্যে বিতর্ক। প্রথম সংবাদপত্র 'বার্তাকু' খবর দিল যে গুজরানওয়ালার গোয়ালারা গরু পোষা বন্ধ করে গোয়ালেই 'প্রিপারেটরি ক্লাস' বসাচ্ছে; স্কুলে তারাই হচ্ছেন মাস্টার। দ্বিতীয় সংবাদপত্র 'গদাধর' এর প্রতিবাদে জানাল, 'বার্তাকু' ইদানীং যে সমস্ত খবরে—

... যা লিখেছে সব ক'টা সমাজের বিরোধী,
যতগুলো প্রগতির দ্বার আছে নিরোধী।

এরপর শহরে ঘুঁটে জ্বালানো, গামলায় গোয়ালাদের চোনা জমানো ইত্যাদির উদাহরণ দিয়ে 'গদাধরে' যখন লেখা হয়:

বার্তাকু কাগজের ব্যঙ্গে যে গা জ্বলে,
সুন্দর মুখ পেলে লেপে ওরা কাজলে।

—তখন নিশ্চিতভাবেই কিছু সংবাদপত্রের প্রতি কবির বিরক্তি আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। আবার এর উত্তরে 'বার্তাকু' যখন প্রতিপক্ষ সম্পাদককে বলে—

মাস্টার না হয়ে যে হলে তুমি এডিটর
এ লাগি তোমার কাছে দেশটাই ক্রেডিটর।

—তখনও এই বক্তব্যের পেছনে কবির সায় আছে এমন অনুমান উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ছড়াটির শেষ দিকে 'বার্তাকু'র বরাত দিয়ে যদিও বলা হয়েছে—

... এ জগতে ঠাট্টা—সে ঠাট্টাই
গদা রেখে লও সেই পাঠটাই।

তবুও ছড়ার রচনাগুলোকে কি শুধু ঠাট্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়? এ প্রসঙ্গে সুধীরচন্দ্র করের (২০১৪: ৮৮) মন্তব্য স্মর্তব্য—

> কবি লিখেছেন, 'হাসি হাসাই'। ... হাসিঠাট্টা রসিকতায় প্রতিপক্ষের প্রতি তাঁর শরাঘাত সোজাসুজি ছিল না। কথায় আড় রেখে বলতেন। সেটুকু বুঝে নিতে বুদ্ধি না খেলিয়ে উপায় ছিল না। বুঝে নিলেই কুপোকাত। তিনি যেন অপেক্ষাই করতেন ওই দেখবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেও নানা সময়ে সংবাদপত্রসহ নানা সমালোচনার শিকার হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪২২: ২০৬) লিখেছেন:

> জীবনের বেশির ভাগ সময়জুড়ে বাবা যে তীব্র ও অন্যায্য সমালোচনার শিকার হয়েছেন, খুব কম লেখককেই তেমন আঘাত সইতে হয়েছে। এগুলোর খুব কমই সাহিত্য-সমালোচনা ছিল। তিক্ত তো ছিলই, কখনও কখনও এমনকি অশালীনও ছিল। একশ্রেণির বাংলা সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে এরূপ কটুকাটব্যের কারণ ছিল কাগজের কাটতি বাড়ানো। অবশ্য আরও গূঢ়তর একটা কারণ ছিল। এ দেশের লোকদের একটা বড় অংশ কখনোই তাঁকে আপন ভাবতে পারেনি। তাঁর জন্ম হয়েছে অভিজাত পরিবারে, তিনি লিখেছেন একেবারে নিজস্ব এক ভাষায় যার সঙ্গে আগের বা সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে কোনো মিল নেই। অধিকন্তু, তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, যাঁরা গোঁড়া হিন্দুত্বকে সংস্কার করতে চাওয়ায় সমাজের চোখে হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিলেন।

প্রথম জীবনে তিনি এসবে ক্ষুণ্ন হয়ে 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক কবিতা লিখেছিলেন। শেষজীবনে সজনীকান্ত দাসের কাছে এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

ছড়ায় রবীন্দ্রনাথের গ্রামকেন্দ্রিক অবলোকন গাঢ়। জীবনের শেষপর্বে খুব সাধারণ দৈনন্দিন বিষয় নিয়ে প্রচুর লিখেছেন তিনি। এমন সব বিষয় ও ভাবকে পদ্যের বন্ধনের মধ্যে নিয়ে এসেছেন, সচরাচর যা তার যুগের কবিতায় পাওয়া যায় না। গ্রন্থের পঞ্চম ছড়াটির পুরো অবয়বই এ ধরনের খণ্ড খণ্ড দৃশ্য দিয়ে গঠিত। ওই ছড়ায় ছড়িয়ে থাকা দৃশ্যগুলোকে যদি চলচ্চিত্রের ফ্রেমে বন্দি করা যায় তাহলে গ্রামবাংলার প্রতিদিনের জীবন সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। যেমন:

দৃশ্য ১: এক চাষি ক্ষেতের আল উঁচু করছে; ছকু মামি খেতে ভাদুরে মুলা তুলছে, তার পিঠের ওপর ঝুলে আছে শিশুসন্তান; ভণ্ড মালী লাউডাঁটাতে ঝাঁকা ভরছে; কলুবুড়ি পাঁচমিশুলে শাকসবজি তুলছে; হঠাৎ বৃষ্টি মাঠঘাট ভিজিয়ে দিচ্ছে।

দৃশ্য ২: গোকুল ছোঁড়া থোলো থোলো কাঁচা সুপারি পাড়ছে; সাঁওতালি মেয়েরা কচু পাতায় মাথা ঢেকে পেয়ারা বাগানে; পাখির ছানা ধরতে নিমের ডালে উঠেছে কেউ; গাছের তলায় পা ছড়িয়ে ভুলু আমলকী চিবোচ্ছে।

দৃশ্য ৩: রান্নাঘরের পাশে ছাইয়ের গাদা জমেছে; দড়ি বাঁধা গাই গামলা চাটছে; মেজ বউ ভিজে চুলের ঝুঁটি বেঁধে মোচার ঘণ্ট বানাচ্ছে;

দৃশ্য ৪: অশথতলায় পাটল গরু চোখ বুজে বসে আছে; ছাগলছানা কচি ঘাসের খোঁজে ঘুরছে; পাড়ার মেয়ে আঁচল মেলে ডোবায় মাছ ধরছে; মাঠে মাঠে ব্যাঙ ডাকছে; ধোপা কাপড় ধুচ্ছে।

দৃশ্য ৫: হাঁটুরে চলেছে মাথায় গামছা বেঁধে; কাঠুরের মাথায় ভেজা কাঠের আঁটি; নাপিত-বৌ পানের কৌটা হাতে হনহনিয়ে চলছে; কামার গরুর গাড়ির চাকা মেরামত করছে।

দৃশ্য ৬: পাড়ির কাছে বাঁধ ভেঙে ডিঙিনৌকা আধাডোবা; জেলের পোঁতা বাঁশের খোঁটায় বসে আছে মাছরাঙা; দূরে কানায় কানায় পূর্ণ নদীতে পাল তুলে চলছে ডিঙি নৌকা।

অন্যান্য ছড়াতেও গ্রামের এমন সব দৃশ্য পাওয়া যায়, যা সাধারণত কবিতার বিবরণে পাওয়া যায় না। যেমন:

ক. গাছের থেকে ইঁচড়গুলো খসে খসে পড়ে,
তালের পাতা ডাইনে বাঁয়ে পাখার মতো নড়ে। (ছড়া ১)

খ. কুচোমাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে—
মেছনি তার সাতগুষ্টি উদ্দেশে দেয় যমেরে।
... মোষের শিঙে ব'সে ফিঙে ন্যাজ দুলিয়ে নাচে (ছড়া ৬)

গ. কাঁচালঙ্কার ফোড়ন লাগায়/ কুড়োনচাঁদের মাসি। (ছড়া ৭)

পল্লির এমন সব সূক্ষ্ম চিত্র থাকলেও *ছড়ায়* নগরের চিত্র নেই বললেই চলে; যদিও সংবাদপত্র, মামলা ইত্যাদি নাগরিক অনুষঙ্গ এতে পাওয়া যায়। চতুর্থ ছড়ায় আর্মানি গির্জার আশপাশের পাড়ায় মানুষের ভিড়; পঞ্চম ছড়ায় কাঁসার ঘণ্টা বাজিয়ে পুরানো কাপড় দিয়ে বেচাকেনা; অষ্টম ছড়ায় চাঁদনিচকে চুল ছাঁটা, বড়শি-বেহালায় বাস চলাচল এবং হাবড়ার সারি সারি গাড়ি; নবম ছড়ায় সেনেট হাউসের দেয়াল; এবং শেষ ছড়ায় মান্থলি টিকিট কেনা—এসব চিত্র এসেছে অত্যন্ত গৌণভাবে।

তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় ছড়ার রচনাগুলোতে রবীন্দ্রস্মৃতির কোনো প্রত্যক্ষ চিত্র সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অথচ এর খুব কাছাকাছি সময়েই তিনি লিখেছেন *ছেলেবেলা;* এর অব্যবহিত পূর্বের কাব্যে স্মৃতি একটি প্রধান উপজীব্য। শুধু ষষ্ঠ ছড়ার ২টি পঙ্‌ক্তিতে পাখি পোষার প্রসঙ্গ আছে, যা কবির জোড়াসাঁকোর স্মৃতির অংশ—

খাঁচার মধ্যে শ্যামা থাকে, ছিরকুটে খায় পোকা—
শিস্‌ দেয় সে মধুর স্বরে, হাততালি দেয় খোকা।

ছড়ায় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় বিষয় স্থাননাম নিয়ে খেলা করা। আলোচ্য গ্রন্থের বেশ কটি রচনায়ও স্থাননাম নিয়ে কৌতুক আছে। এর চরম প্রকাশ ঘটেছে দশম ছড়ায় যেখানে প্রায় প্রতি বিকল্প পঙ্‌ক্তিতে একটি স্থাননাম আছে—

(১) সিউড়ি, (৩) মথুরা, (৬) নরসিংগড়, (৮) সুরুল, (৯) পেশোয়ার, (১২) পানিপথ, (১৩) হাথুয়া, (১৮) রুড়কি, (১৯) বোঁচকা, (২১) সুলতানপুর, (২৩) বামড়া, (২৬) নওয়াদা, (২৮) ধুবড়ি, (২৯) কটিহার, (৩২) দামোদর, (৩৫) চুঁচড়ো, (৩৭) নাড়াজোল, (৪০) কাটোয়া, (৪১) খড়দা, (৪৭) সাসারাম, (৪৯) চেউকি, (৫২) জসিদি, (৫৪) মুঙের, (৫৬) বাঁকুড়া, (৫৮) বাণ্ডেল, (৫৯) কোদারমা, (৬১) সাতক্ষীরা, (৬২) পাঁচথুপি, (৬৩) নাসিক, (৬৫) মাদ্রাজ, (৬৭) পাকুড়, (৬৯)

বাহাদুরগঞ্জ, (৭২) খুলনা, (৭৫) কানু জংশন, (৭৯) কাটুনি, (৮১) বিকানির, (৮৪) মশুরি, (৯৩) কানপুর, (৯৫) লাশা, (১০০) মজাফরপুর, (১০৩) জৌনপুর, (১০৬) মেয়ো।

এই প্রতিটি স্থাননামের সঙ্গে রয়েছে নানা অদ্ভুত চরিত্রের আজগুবি কাজকর্ম। এর একটি যোগসূত্র হরিরাম মৈত্তিরের ভ্রমণ। কিন্তু এই ভ্রমণকে ভূগোলের মানচিত্রের সঙ্গে মেলানো অসম্ভব।

ছড়াতে কবির আর একটি প্রিয় বিষয় রান্না এবং খাদ্য। *ছড়া*র নানা রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে এই বিষয়টি। তবে দ্বিতীয় ছড়াটিতে মাছের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি নিজেই মৈত্রেয়ী দেবীকে (১৯৬৭ ২৩৭) বলছেন:

> আজ সেই মাছের বৃত্তান্ত লিখতে লিখতে নানা রকম মাছের আস্বাদ মনে পড়েছে। ... আমি যখন মেজদার ওখানে ছিলুম তখন বৌঠাকুরণকে দিয়ে নানা রকম experiment করিয়েছি। তা ছাড়া রথীর মার কাছে তো একটা বড় খাতা ছিল আমার রান্নার, সে কোথায় গেছে কে জানে। টিনের মাছের কচুরি আর জ্যামের প্যারাকী, সে সব মন্দ খাদ্য নয়।

বিচিত্র খাবার তৈরির বিষয়ে যে রবীন্দ্রনাথের বরাবরই আগ্রহ ছিল, তা তার ঘনিষ্ঠজনদের বিবরণীতে পাওয়া যায়। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪২২: ৫৬-৫৭) তাঁর বাবাকে নিয়ে স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন যে, উনিশ শতকের একেবারে শেষদিকে খামখেয়ালী সভা প্রতিষ্ঠিত হলে (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭) ঠাকুরবাড়িতে এর অধিবেশনের সময় তাঁর মাকে রান্নার জন্য কবি ফরমাশ করতেন যত রকমের অদ্ভুত খাবারের, যেগুলি পূর্বে কখনো রান্না হয়নি। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীও (১৩৪৯: ১৩) লিখেছেন:

> নিত্য নতুন রান্না হোলে তিনি ভারি খুশী হতেন, তাছাড়া নিজেও নানা প্রকারের রন্ধন-তালিকা আমাদের বলতেন, ... অনেক সময় হেসে বলতেন, ‘বৌমা, তোমার শাশুড়ীকে আমি কত রান্নার মেনু জোগাতুম, আমি অনেক রান্না শিখিয়েছিলুম, তোমরা বিশ্বাস করবে না জানি।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় ছড়াটিতে কবিকল্পনায় এর খানিকটা প্রতিফলন পাওয়া যায়।

রস বা বিষয়-ভাবের এই পরিচয়ের পরও মনে রাখতে হবে ছড়া শুধু কবির জাগতিক অভিজ্ঞতার পরিচয়ই নয়; তার মানস-জগতেরও সৃষ্টি। অমিয় চক্রবর্তীর (সনৎকুমার ১৪০০: ২২৩-২৪) ভাষায়:

> ছড়া যেন সমস্ত জাতির মনোনীহারিকার সৃষ্টি, বহু জীবনের অস্ফুট আশা-আকাঙ্ক্ষার রঞ্জিত স্বপ্নময় ইতিহাস। তার মধ্যে আছে ‘লোকস্মৃতি’।
>
> রবীন্দ্রনাথের ‘ছড়া’-গ্রন্থের কবিতায় তেমনি দেখি শুধু জাগ্রত কবি-চিত্তকে নয় তাঁর মহামানসিক সৃষ্টি রাজ্যকে, যেখানে নানা মহলের মনন বেদনাময় অনুভূতি আলোড়িত হচ্ছে, সংজ্ঞায় পৌঁছয় নি। তাঁর বৃহৎ সত্তায় যেন আরেকটি পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় তাঁর

> নিজের কাছেই নতুন, বড়ো সৃষ্টির অবসরে আপন অগোচরলোক হতে চিন্তাভাবনার ভগ্নখণ্ডগুলি তুলে দেখছেন, ছন্দের বাহনে আমাদেরও কাছে হাসির ছটায় ব্যক্ত হল। হঠাৎ-লব্ধ আকস্মিকতাই এর প্রধান সুর, কথাগুলি স্বপ্নের ন্যায়সূত্রে বাঁধা।

চার

'ছড়াত্ব' বিবেচনায় *ছড়া*র সবচেয়ে প্রশ্নবোধক ক্ষেত্র এর আকৃতি। গ্রন্থের ১১টি ছড়ার মধ্যে ৪টির পঙ্‌ক্তিসংখ্যা শতাধিক, ২টির অর্ধশতাধিক, ৩টির ৪০-ঊর্ধ্ব। হ্রস্বতার বিবেচনায় একাদশ ছড়াটি সবচেয়ে ছোট—১৬ পঙ্‌ক্তির; দ্বিতীয় হ্রস্ব ২৮ পঙ্‌ক্তির সপ্তম ছড়াটি। আমরা জানি যে, রবীন্দ্রনাথ দুই ধরনের ছড়াকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রথমটি তাঁর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগৃহীত অথবা যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত *খুকুমণির ছড়া*র ধরনের; দ্বিতীয়টি রাধা-কৃষ্ণ বা হর-গৌরীর দীর্ঘ কাহিনিভিত্তিক ছড়া ধরনের। কিন্তু *ছড়া*র ১১টি রচনার মধ্যে এ দুইয়ের কোনোটিরই ধরনগত সাদৃশ্য দেখা যায় না।

বাংলা লোকসাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৭৩: ১৪৫) এই আকৃতির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

> 'ছড়া' কাব্যগ্রন্থের রচনাগুলো ছড়ার ছন্দে এবং ছড়ার ভাব অনুসরণ ক'রে রচিত হ'লেও এরা প্রচলিত ছড়ার মত আকারে পরিমিত নয়। এরা দীর্ঘ কবিতার আকারে রচিত। এলোমেলো ভাব ও লৌকিক ছন্দের গুণেই এরা রবীন্দ্রনাথের মতে ছড়া।

অমিয়কুমার সেন মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের ছড়া লোকছড়ার পরিবেশের পুনর্সৃষ্টি (recreation)। প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে তাঁর মন্তব্য (অনুত্তম ২০০৩: ৫১৪-১৫৮)—

> আমাদের দেশের প্রচলিত লৌকিক ছড়া এবং রূপকথা ইত্যাদির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের উল্লেখ করেছি। তিনি একদা ক্রমবর্ধমান বিস্মৃতি থেকে এদের উদ্ধারসাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। লোকশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেও তিনি এদের যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। ছড়ার ছন্দকে তিনি সাধুসাহিত্যের আসরে পাংক্তেয় করেছিলেন। শেষ জীবনে ব্যাপকভাবেই তিনি ছড়াজাতীয় কবিতা রচনা করেছেন। খাপছাড়া (১৯৩৭), ছড়ার ছবি (১৯৩৭), ছড়া (১৯৪১) প্রভৃতি গ্রন্থ পুরোপুরি ছড়াজাতীয় কাব্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে এ ধরনের বহু কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই প্রাচীন ছড়াগুলির মধ্যে পুরাতন বাংলার একটি পরিবেশের ছবি আছে। সে ছবির মধ্যে পরিপূর্ণ চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস না থাকলেও চকিত রেখায় এবং ক্ষণিক বর্ণসমাবেশে আমাদের মনে একটি চিত্র জেগে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় ছড়ার সুরের ঝংকার এবং ছড়ার জগতের প্রাকৃতিক পরিবেশটি নূতন করে সৃষ্টি করেছেন।

অমিয়কুমারের আগে *আনন্দবাজার পত্রিকা*য় (২৬ অক্টোবর ১৯৪১) যখন *শেষ লেখা* ও *ছড়া*র আলোচনা প্রকাশ হয়, তখনও আলোচক লক্ষ করেছিলেন যে 'বাঙ্গলার দিদিমা ও ঠাকুরমাদের মুখে মুখে যে বিশাল 'ছড়াসাহিত্য' বিরাজ করিত, সেই টেকনিকই আয়ত্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র রূপ দিয়াছেন'।

আনন্দবাজারের আলোচনাটি প্রকাশ হয় ১৩৪৮ সনের ৯ কার্তিক। এর আগে *প্রবাসীর* ভাদ্র সংখ্যায় কবি অমিয় চক্রবর্তীও প্রায় সমধরনের মন্তব্য করেন: '... গ্রন্থের ছড়া-ঘেঁষা শৈথিল্যে'র মধ্যেও শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নিপুণ প্রভুত্ব আছেই, যেমন রয়েছে চিন্তার আঙ্গিক কিছু ছাঁদ সেই লোকসাহিত্যের ...'। একই আলোচনায় অমিয় বলছেন, 'নিজেকে নিয়ে খেলা। এর মধ্যে লোকসাহিত্যের রস মিলেছে সচেতনতার ঐশ্বর্যে (সনৎকুমার ১৪০০: ২২৪, ২২৮)।

লোকছড়ার এই পুনর্সৃষ্টির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ৬ নম্বর ছড়ার শেষ স্তবক। এই স্তবকের অধিকাংশ পঙ্‌ক্তি বাংলায় সুপ্রচলিত লোকছড়ার চরণ ভেঙে তৈরি করেছেন কবি—

> দিন চলে যায় গুনগুনিয়ে ঘুমপাড়ানির ছড়া,
> শানবাঁধানো ঘাটের ধারে নামছে কাঁখের ঘড়া।
> আতাগাছে তোতাপাখি ডালিমগাছে মৌ,
> হিরেদাদার মরমরে থান, ঠাকুরদাদার বউ। ...
> ... খোকা গেছে মোষ চরাতে খেতে গেছে ভুলে,
> কোথায় গেল গমের রুটি শিকের 'পরে তুলে। ...
> ... কচি কুমড়োর ঝোল রাঁধা হয়, জোড়পুতুলের বিয়ে,
> বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিয়ে। ...
> ... তালগাছেতে ছুতোমথুমো পাকিয়ে আছে ভুরু,
> ভক্তিমালা হড়মবিবির গলাতে সাত-পুরু। ...

এই ছড়ার পাণ্ডুলিপির বর্জিত অংশে আবার পাওয়া যায় অন্য কয়েকটি লোকছড়ার পুনর্সৃষ্টি—

> ননদ হেথা বিয়ে করেন স্বপ্ন দেখার বিয়ে
> টিয়ের বিয়ে হোত যেথায় লাল গামছা দিয়ে।
> ছপণ কড়ি গুন্‌তে গুন্‌তে শেষ হয়ে যায় বেলা ...
> ... বর্গি করে ঘুম পাড়াবার ছড়ায় উপদ্রব,
> তিন কন্যে দানের খবর নয়কো অসম্ভব।

পঞ্চম ছড়ায়ও এ ধরনের পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায়—

> লখা চলে ছাতা মাথায়/ গৌরী কনের বর—
> ড্যাঙ ড্যাঙাড্যাঙ বাদ্যি বাজে,/ চরকডাঙায় ঘর। ...
> ... চরকডাঙায় ঢাক বাজে ওই/ ড্যাড্যাঙ ড্যাঙ।
> মাঠে মাঠে মক্‌মকিয়ে/ডাকছে ব্যাঙ॥

অন্যান্য ছড়ার কয়েকটিতেও লোকছড়ার ভাঙা চরণ/শব্দ, চরিত্র অথবা ভাবের প্রতিফলন রয়েছে। বাসন্তী চক্রবর্তী (১৩৮৯: ৪৫৫-৫৬) দাবি করেছেন, *ছড়ার ছবির* তুলনায় *ছড়ায়* লোকছড়ার প্রভাব প্রত্যক্ষ—

> 'ছড়ার ছবি'তে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র ছবি এঁকে চলেছেন কবি। কিন্তু 'ছড়া' একেবারে শিশুচিত্তের এলোমেলো ভাবকল্পনার জগতে ডানা মেলে অনবদ্য হয়ে উঠেছে 'ছড়া'র

> জগতে। গ্রাম্য ছড়াগুলির যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—তা 'খাপছাড়া' বা 'ছড়ার ছবি'তে তেমনতরো মহিমায় ফুটে ওঠেনি যেমন 'ছড়া' কাব্যগ্রন্থে উঠেছে।

লোকছড়ার এসব প্রত্যক্ষ প্রভাব সত্ত্বেও দীর্ঘ অবয়বের কারণে *ছড়া*র রচনাগুলোর ২০ 'ছড়াত্ব' নিয়ে দ্বিধার অবসান ঘটাতে পারেনি। বিশ্লেষকদের কেউ কেউ এই সীমাবদ্ধতার বিপরীতে *ছড়া*র রচনাগুলোতে অসংলগ্ন ও এলোমেলো ভাব, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক উক্তি, চিত্রধর্মিতা—*ছড়া*র এসব বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (১৪০৪: ৭২৫) মন্তব্য—

> 'ছড়া' খাপছাড়ার মতোই একখানা ছড়ার বই—অসমঞ্জস ও অদ্ভুত উক্তির বিচিত্র সমাবেশময়। শেষ জীবনে অসুস্থ অবস্থায় কবি-মনে এই এলোমেলো, ছিন্নভিন্ন টুকরা কথার ঝাঁক কোথা হইতে উপস্থিত হইত। কবি মুখে মুখে ছড়াগুলি বলিয়া যাইতেন। কবি-চিত্তে এইরূপ পরস্পরসম্বন্ধহীন অদ্ভুত সব উক্তি এবং হাস্যরসের আবির্ভাব যে অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক, কবি তাহা বারে-বারে বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্বের (গোধূলি পর্যায়) পরিশ্রমী-গবেষক শুদ্ধসত্ত্ব বসু *ছড়া*র প্রতিটি রচনা নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে অন্তত ৩টি রচনায় তিনি পূর্বে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। ষষ্ঠ ছড়াটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য (শুদ্ধসত্ত্ব ১৪০৬: ৪২৬-২৭):

> কবিতাটির মধ্যে যথার্থ ছড়ার চরিত্র কিছুটা পাওয়া যাবে। অসংলগ্নতা এবং অদ্ভুত উক্তির সমাবেশই ছড়ার বৈশিষ্ট্য। পারম্পর্য রেখে অর্থবহ মনোহারী পঙ্ক্তি সমুচ্চয়কে ছড়া হিসেবে সংজিত করা ঠিক নয়। ছড়ার মধ্যে এলোমেলো কথা খেয়ালী চরিত্র নিয়ে হাজির হয়, একের পৃষ্ঠে অন্য যে কথাটা আসে—তাদের উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে না, শুধু অব্যবহিত সন্নিকটতাই তাদের মধ্যে গাঁটছড়া বেঁধে দেয়। এই চরিত্র 'ছড়া' গ্রন্থের ৬ সংখ্যক কবিতায় বর্তমান, তাই এই কবিতাকে যথার্থ ছড়া বলা যায়। তবু এই ছড়ার ১২/১৪ পঙ্ক্তি অন্তর অন্তর চার পঙ্ক্তির এক রকমের ধুয়ো লিখিত হয়েছে—যার মাধ্যমে কবি ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে আবহমান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারা চিরকালীন, কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে পড়ে পৃথিবীকে অপঘাতে তচনচ করে ছাড়ছে।

সপ্তম ছড়া সম্পর্কেও তার অবলোকন (শুদ্ধসত্ত্ব ১৪০৬: ৪২৭): 'অসংলগ্নতা এবং অস্বাভাবিকতা যেমন এর পদে পদে, তেমনি এলোমেলো ভাবনার টুকরো দিয়ে খচিত সেই পদগুলি।' তাঁর ভাষায় শেষ ছড়াটিতেও 'আজগুবি ও এলোমেলো চিন্তার সমাবেশে আনন্দরস একেবারে স্বাভাবিক হয়ে প্রবাহিত হয়েছে।' (শুদ্ধসত্ত্ব ১৪০৬: ৪২৮)

*ছড়া*র রচনাগুলোতে 'অসংলগ্ন মনের খাপছাড়া ভাবকল্পনা একের সঙ্গে আর এক এসে যুক্ত হয়ে মালা গেঁথে চলেছে'—এমনই মনে করেন বাসন্তী চক্রবর্তী (১৩৮৭: ৪৫৫-৪৫৬)। তবে এর মধ্যেও তাঁর মতে 'অসংলগ্ন বা এলোমেলো বলে গোটাটাই গোলমেলে নয়'; বরং 'একের পর এক মনের ছিন্নচেতন ভাবনাকে কবি রূপ দিয়ে গেছেন একেবারে চলতি ভাব এবং ভাষায়।'

এই অসংলগ্নতার কার্যকারণসূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর একটি দার্শনিক ভিত্তির সন্ধান করেছেন অমিয় চক্রবর্তী তাঁর পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ-সমালোচনায় (সনৎকুমার ১৪০০: ২২৫-২৬)। তাঁর বিশ্লেষণে—

> ছড়ার রাজ্যে আছে অস্তিত্বের মধ্যে একটা অসঙ্গতির ছবি, যার নিহিতার্থ-সঙ্গতিকে মানুষ খোঁজে। একেই য়েটস বলেছেন আধুনিক কবিতার দৃষ্টিতে অসঙ্গতির দার্শনিকতা। বাহিরে এবং মনে ঘটনার পারম্পর্য নয়, প্রতিবেশিত্বও রয়েছে। ... অস্তিত্বের নিগূঢ়তম অসঙ্গতি দেখি ছড়ার রাজ্যে কিন্তু ছড়া সেখানে আয়না, যা সর্বত্র হচ্ছে তার চলচ্ছবি।

এই অসংলগ্নতার পটভূমিতে আমরা *ছড়া*র ১১টি রচনার দিকে ফিরে তাকাতে পারি। আমাদের বিবেচনায় এর অন্তত ৬টিকে কোনোভাবেই সম্পূর্ণ অসংলগ্ন বলা যায় না। এই রচনাগুলোতে বন্ধনসূত্র বা cross-cutting theme আছে। যেমন:

> প্রথম ছড়া: চৌকিদারের হাঁচি,
> দ্বিতীয় ছড়া: নদীতে কদমা পড়ে জল মিষ্টি হয়ে যাওয়া,
> তৃতীয় ছড়া: সংবাদপত্রে সংঘাতের খবর ও গুজব,
> চতুর্থ ছড়া: বিড়াল নিয়ে দুই ভাইয়ের মামলা,
> নবম ছড়া: দুই সংবাদপত্রের দ্বন্দ্ব,
> দশম ছড়া: সিউড়ির হরেরাম মৈত্তিরের ভ্রমণ।

তবে সংলগ্নতার বন্ধনসূত্র থাকলেও এর আখ্যানে যে উদ্ভট, অস্বাভাবিক ও এলোমেলো ঘটনা আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অবশিষ্ট ৫টি ছড়ার মধ্যে পঞ্চম ছড়াটির দৃশ্যসজ্জা আমরা ইতিপূর্বে অঙ্কন করেছি। এটিকেও সম্পূর্ণ অসংলগ্ন বলা সমীচীন হবে না। তবে সপ্তম, অষ্টম ও একাদশ ছড়ার ভাবের পারম্পর্য অসংলগ্ন। ৩টি ছড়াতেই দুই অথবা তিন-চার পঙ্‌ক্তি পরপরই প্রসঙ্গের পরিবর্তন হয়েছে। এগুলোর আদলকে অনেকটা 'আগডুম বাগডুম' শীর্ষক লোকছড়ার মতো বলে মনে করা যায়।

ষষ্ঠ ছড়াটির গঠনবৈচিত্র্য বা রূপরীতি পৃথক বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ১০৬ পঙ্‌ক্তির এই রচনাটি ৫টি স্তবকে বিন্যস্ত। এর চরণবিভাজন যথাক্রমে ২০, ১৮, ১৮, ১৮ ও ৩২। প্রথম ৪টি স্তবকের প্রতিটির শেষ ২ পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে পাখির প্রসঙ্গ; এই ৮ চরণ দিয়ে একটি পৃথক ছড়াও তৈরি করা যায়—

> ১৯ পঙ্‌ক্তি: খাঁচায় পোষা চন্দনাটা ফড়িঙে পেট ভরে—
> ২০ পঙ্‌ক্তি: সকাল থেকে নাম করে গান, হরে কৃষ্ণ হরে।
> ৩৭ পঙ্‌ক্তি: খাঁচার মধ্যে ময়না থাকে, বিষম কলরবে
> ৩৮ পঙ্‌ক্তি: ছাতু ছড়ায়, মাতায় পাড়া আত্মারামের স্তবে।
> ৫৫ পঙ্‌ক্তি: খাঁচার মধ্যে শ্যামা থাকে, ছিড়কুটে খায় পোকা—
> ৫৬ পঙ্‌ক্তি: শিস দেয় সে মধুর স্বরে, হাততালি দেয় খোকা।
> ৭৩ পঙ্‌ক্তি: টিয়ের মুখের বুলি শুনে হাসছে ঘরে-পরে—
> ৭৪ পঙ্‌ক্তি: রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।

ভাবের দিক থেকে এই ৮ চরণের সঙ্গে ছড়াটির বাকি অংশের কোনো সম্পর্ক নেই। আবার ওই ৪ স্তবকের উল্লিখিত ২ পঙ্‌ক্তির পূর্ববর্তী প্রতিটি ২ পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খবর। ওই ৮টি পঙ্‌ক্তি আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি। শেষ স্তবকের ৩২ পঙ্‌ক্তির অধিকাংশই লোকছড়ার পুনর্সৃষ্টি তাও আমরা বলেছি। তবে এর শেষ ৬ পঙ্‌ক্তি মহাযুদ্ধের খবর। ছড়াটির এই ৪৮ পঙ্‌ক্তি বাদ দিলে বাকি ৫৮ পঙ্‌ক্তি অসংলগ্ন ভাব সমন্বয়ে তৈরি।

এই অসংলগ্নতার প্রধান বন্ধনসূত্র মিল বা অন্ত্যমিল। অমিয় চক্রবর্তী *ছড়া*র প্রথম সমালোচনাতেই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন (সনৎকুমার ১৪০০: ২২৬)—

> ছড়ার অসংলগ্নতা সংলগ্ন হয়ে আছে আরেক সূত্রে। সেটা হচ্ছে মিলের মিল, ছন্দ ঝঙ্কারের বন্ধন। 'ছড়া' বইয়ের কবিতায় মিল এবং অনুপ্রাসের চমৎকারিত্ব চক্‌মকি জ্বালিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোন্ পথে চলেছি খেয়াল হয় না, ছন্দে পা ফেলে অনুসরণ করি। মিলের অভিনবত্ব কোন্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তার দৃষ্টান্ত কী ক'রে দেব, 'ছড়া'র প্রতিপদেই এই মিল ঘটছে। সব চেয়ে যা অভাব্য সেইটে এক অভাবনীয় মিলের স্কন্ধে চড়ে, একেবারে অনিবার্য। ... মিলেই খুশি, মিলেই ভাবের ঝলকানি, মিলেই বর্ণ এবং ব্যঞ্জনা, মিলেই অনির্বচনীয়তা। আবার মিলেই প্রচ্ছন্ন পরিহাস, তীব্র সমালোচনা, আধুনিক কালের প্রসঙ্গ, রূপকথার অভাস। ছড়া বইখানিকে মিলের প্রসাধন বলা যায়, এমন বৈচিত্র্য কোথাও নেই।

মিল যেমন অসংগতিকে যোজনা করেছে তেমনি ছড়ার রাজ্যে গরমিল ঘটিয়েছে এই মিল। মিলের টানে যা হবার নয় তা হয়েছে।

অভাবিত মিলের বিষয়টি শুদ্ধসত্ত্ব বসুকেও (১৪০৬: ৪২৪) চমৎকৃত করেছে—

> ছড়ায় মিলের চমক অকস্মাৎ এসেছে। মিলের ব্যাপারটি যদি আগে থেকে জানা যায়—তবে তার খুশী করার ক্ষমতা কমে যায়, কিন্তু অভাবিতপূর্ব মিলে পাঠকের মনের খুশী উপচে পড়ে। ছড়ায় শব্দের যোজনায় কবির অনায়াসসিদ্ধি দেখা গেছে।

কেতকী কুশারী ডাইসন (১৯৯৭: ৬৭৭) *ছড়া*য় অন্ত্যমিলের প্রভুত্বকে তুলনা করেছেন রুশ শাসক জারের সঙ্গে।

*ছড়া*র দ্বিতীয় রচনাটি লিখে মৈত্রেয়ী দেবীকে কবি নিজেও মিল ছড়ানোর কথা বলেছিলেন— এ কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তাঁর ভাষ্যে, 'মিল একেবারে দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছি আর একেবারে নিখুঁত মিল তা মানতে হবে!' (মৈত্রেয়ী ১৯৬৭: ১৭৮)। ছড়াটির শেষদিকে পাওয়া যায়—

> অতএব এই-কী পাগলামি,/ কলম উঠল ক্ষেপে,
> মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে/ মিলের স্কন্ধে চেপে।
> কবির মাথা ঘুলিয়ে গেছে/ বৈশাখের এই রোদে ...

ছড়ায় অভাবিত মিলের চমক সত্যিই চমকপ্রদ—

ক. ভয়ে ভয়ে ছি ছি বলে কলেজের কর্তারা,
তার পরে মাপ চেয়ে চলে যায় ঘর তারা। (ছড়া ৩)
খ. চিন্তামণির কয়লাখনির/ কুলির ইনফ্লুয়েঞ্জা।
বিরিঞ্চিদের খাজাঞ্চি ওই/ চণ্ডীবরণ সেন-জা। (ছড়া ৭)
গ. কুকুরের লেজে দেয় ইন্‌জেক্‌শ্যান,
মান্থলি টিকিট কেনে জলধর সেন। (ছড়া ১১)

একেবারে ইংরেজি পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করে অন্ত্যমিল তৈরির নমুনা পাওয়া যায় ছড়ায়, রবীন্দ্রকাব্যে যা অকল্পনীয়—

পয়লা দলের knave, idiot কি কেবল,
liar সে humbug, cad unspeakable—

অন্ত্যমিলের জেরে হিন্দি-উর্দুও ঢুকে পড়েছে ছড়ায়—

ক. নীচে থেকে বলে হেঁকে রহমৎ,
বাংলা জবানি তুমি কহো মৎ। (ছড়া ৮)
খ. চোখ রাঙা ক'রে বলে দারোগা,
খানামে লে কর্ হম্ মারো গা। (ছড়া ১০)

কিন্তু মিলের এই চকমকির মধ্যেও অন্তত একটি অমিল চোখে পড়ে—

দামোদরে বুধুরাম খেয়া দেয়,
চেপে বসে ডেপুটির পেয়াদায়। (ছড়া ১০)

ইংরেজি, উর্দু-হিন্দি ব্যবহারের পাশাপাশি একেবারে কথ্য বা আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারও মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে—পুছি নাই (ছড়া ২), জজ সা'ব (৪) বেস্পতিবারে (১০), ঘুনসি (৮) এক আখরে, সন্ধ, ভেবড়ে (৩) এর উদাহরণ। তবে ছড়ার বিশিষ্ট শব্দ পাওরা যায় মাত্র একটি—ঘুমদার। কিছু কিছু স্থানে শব্দব্যবহার ও চরণসজ্জা কবিতাকে স্পর্শ করেছে—

নাইল-তটিনীতট-বিহারিণী কিশোরী। (ছড়া ৪)

রবীন্দ্রনাথ ছড়ায় সাধু ভাষা ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু *ছড়াতে* সাধু ভাষার ব্যবহার আছে—

প্রকাশ করিতে থাকে দুজনের পটুতা। (ছড়া ৩)

অন্যদিকে অন্ত্যমিলের প্রভুত্ব সত্ত্বেও পঙ্‌ক্তির চলমানতা লক্ষণীয়—

এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধোঁকা ...

সুকুমার সেন (১৯৯৬ ১৮৬) লক্ষ করেছিলেন যে, *ছড়া*র রচনাগুলোতে *খাপছাড়া*র সৌষম্য ও ব্যঙ্গঝাঁঝ নাই, তবে ঝঙ্কার মনোহর। শুদ্ধসত্ত্ব বসু (১৪০৬: ৪২৬) মনে করেন রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থে 'তির্যকভঙ্গীতে ... ব্যঙ্গরস পরিবেশন করেছেন'। অজিত দত্ত (১৯৬০: ৩২০) মনে করেন গ্রন্থটিতে 'বিচ্ছিন্নভাবে ব্যঙ্গ ও কৌতুক দুই-ই আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে একটি খেয়ালখুশির ভঙ্গি এগুলিকে সাধারণ ব্যঙ্গাত্মক ছড়ার থেকে পৃথক করে রেখেছে।'

*ছড়া*র সব রচনাই কৌতুকের। এই কৌতুক রয়েছে একই সঙ্গে বিবরণ ও উপস্থাপনা—উভয়ের মধ্যেই। দ্বিতীয় ছড়াটিতে আমরা দেখি ব্রহ্মপুত্র নদের জলে নৌকাডুবিতে বস্তা বস্তা কদমা পড়ে জল শরবত হয়ে গেছে। ফলে নদীর মাছের স্বাদ হয়েছে মিঠাই-গজার মতো মিষ্টি। ছড়ার কৌতুক—

> বাগীশকে কাল শুধিয়েছিলেম/ ব্রহ্মা কি কাজ ভুলল,
> বিধাতা কি শেষ বয়সে/ ময়রা-দোকান খুলল।
> যতীন ভায়ার মনে জাগে/ ক্রমবিকাশ থিয়োরি,
> গলব্ল্যাডারে ক্রমে ক্রমে/ চিনি জমছে কি ওরই।

চতুর্থ ছড়ায় পাওয়া যায়—

> ... কাবুলের সর্দার
> চলে এল উটে চড়ে, পিছে ঝাড়ু বর্দার।
> উটেতে কামড় দিল, হল তার পা টুটা—
> বিলকুল লোকসান হয়ে গেল হাঁটুটা।

ষষ্ঠ ছড়ায় কৌতুকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যঙ্গও—

> পদ্মমণি চচ্চড়িতে লঙ্কা দিল ঠেসে।
> আপনি এল ব্যাক্‌টিরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই।
> হাসপাতালের মাখন ঘোষাল বলেছিল, ভয় নাই।
> সে বলে, সব বাজে কথা, খাবার জিনিস খাদ্য—
> দশ দিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশ জনারই শ্রাদ্ধ।

এ ছড়ায় কৌতুকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডাক্তারদের প্রতি ব্যঙ্গ; তবুও *খাপছাড়া*র ঝাঁজ এতে নেই।

বিশ্লেষকেরা *ছড়া*র চিত্রধর্মিতার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর কিছু উদাহরণ ইতিপূর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম ও অষ্টম—এই দুটি ছড়ার চিত্রধর্মিতার প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন শুদ্ধসত্ত্ব বসু (১৪০৬: ৪২৬-২৭)। পঞ্চম ছড়াটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য:

> ছড়াটি চিত্রধর্মী। বিভিন্ন ছবির মিছিল একের পর এক কবি কলমের তুলিতে এঁকেছেন, কখনো প্রকৃতির ছবি, কখনো বা মানুষের। রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণে কোনো ফাঁক নেই, এবং কল্পনায়ও কোথাও অতিশয়তা দেখা যায় নি। অথচ সর্বত্র চারুত্ব বজায় থেকেছে।

অষ্টম ছড়ার চিত্রধর্মিতার প্রাধান্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শুদ্ধসত্ত্ব। বাসন্তী চক্রবর্তীও (১৩৮৭: ৪৫৬) এই বৈশিষ্ট্যটিকে বলেছেন চিত্রযোজনা—

> একের সঙ্গে আর একের যোগ ভাবের দিক থেকে ঠিক না থাকলেও পারস্পরিক চিত্র যোজনার দিক থেকে মধ্যে একটা সংগতি অবশ্যই আছে। কোনো কোনো স্থানে এমন চিত্র বা শব্দযোজনা করেছেন—যা একেবারেই বালক-বালিকার রসবোধের যোগ্য নয়। 'ছড়া'তে কিছু কিছু বয়স্ক ঠাট্টা টিটকারি আছে, অর্থাৎ 'সমালোচনা' উদ্দেশ্যমূলক বলাও চলে, যদিও তার সংখ্যা অল্প।

ছড়ার ছন্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত অবলোকন ইতিপূর্বে আমরা উপস্থাপন করেছি। কবি ওই ছড়ার ছন্দকে 'প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ' বললেও এই ছন্দকে দলবৃত্ত (স্বরবৃত্ত), কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ও মিশ্রবৃত্তের (অক্ষরবৃত্ত) কোনো একটি ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। *ছন্দ* গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মোট ৫টি লোকছড়ার ছন্দ-নির্দেশ করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ১৩৮২: ৩২১-৩৭):

১. এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা: দলবৃত্ত পয়ার
২. কাক কালো, কোকিল কালো: প্রাকৃত ত্রৈমাত্রিক
৩. টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে: প্রাকৃত ত্রৈমাত্রিক
৪. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর: প্রাকৃত ত্রৈমাত্রিক/দলবৃত্ত পয়ার
৫. বক ধলো, বস্ত্র ধলো: ছড়ার ছন্দ।

এছাড়া 'খনা ডেকে বলে যান/ রোদে ধান ছায়ায় পান' শীর্ষক খনার বচনকেও কবি দুই মাত্রার চলনের ছড়ার ছন্দে রচিত বলে মত দিয়েছেন।

ঈশ্বর গুপ্তের ছড়া 'তুমি মা কল্পতরু'-কে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন 'প্রাকৃত ছন্দের ভঙ্গিবৈচিত্র্য'র উদাহরণরূপে। তাঁর তৈরি এবং পরে *খাপছাড়ায়* সংযোজিত ১টি ছড়া (আইডিয়াল নিয়ে থাকে) এবং *ছন্দ* গ্রন্থের জন্য তৈরি ৩টি (একটি কথা শুনিবারে; টোটকা এই মুষ্টিযোগে; পালা করি কাটো)—এই ৪টি ছড়াকে কবি অভিহিত করেছেন মিশ্রবৃত্ত বলে। *খাপছাড়ায়* উপস্থাপিত অন্য ৩টি ছড়াকে (কাঁধে মই, বলে কই; খুব তার বোলচাল; শিমুল রাঙা রঙে) অন্তর্ভুক্ত করেছেন কলাবৃত্ত পয়ারে। এর থেকে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত—তিনটি ছন্দেই ছড়া রচিত হয়েছে বলে মনে করেন। আবার এই ৩টি ছন্দের সঙ্গে 'পয়ার' কথাটি যুক্ত করেছেন তিনি; কোথাও এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন 'প্রাকৃত ত্রৈমাত্রিক'।

সুকুমার সেন (১৯৯৬: ১৮৬) দাবি করেছেন, 'ছড়া'র কবিতাগুলি পুরোপুরি ছেলেভুলানো ছড়ার ছন্দে ও ছাঁচে রচিত।' বাসন্তী চক্রবর্তীও *ছড়ার* রচনাগুলোকে ছড়ার ছন্দের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে মেনে নিয়েছেন (বাসন্তী ১৩৮৭: ৭০):

> 'ছড়া'র প্রত্যেকটি কবিতার প্রতিটি চরণ চতুঃস্বরপর্বিক। অন্তে মিলযুক্ত দলবৃত্ত লৌকিক ছড়ার ছন্দে গঠিত। যেমন—

সুবল দাদা। আনল টেনে। আদম দিঘির। পাড়ে,
লাল বাঁদরের। নাচল সেথায়। রামছাগলের। ঘাড়ে।

আবার—

কদমাগঞ্জ। উজাড় করে।
আসছিল মাল। মালদহে।
চড়ায় পড়ে। নৌকাডুবি।
হল যখন। কালদহে।

এইভাবে দীর্ঘ চরণকে অনেক সময় দুটি পঙ্‌ক্তিতে ভাগ করে দিয়েছেন কবি। এতে বৈচিত্র্যও এসেছে।

*ছড়া*র ১১টি রচনার ছন্দ বিচার করলে দেখা যায় যে, এর ৫টি (১, ২, ৫, ৬, ৭) স্বরবৃত্তে (দলবৃত্তে) রচিত, অন্য ৬টি মাত্রাবৃত্তে (কলাবৃত্ত)। স্বরবৃত্তের মধ্যে ৪+৪+৪+২ পূর্ণমাত্রা এবং ৪+৪+৪+৩ অপূর্ণমাত্রা—উভয় রূপই দেখা যায়। সপ্তম ছড়াটি মূলত স্বরবৃত্তে হলেও এতে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণ আছে। এর কোনো কোনো পঙ্‌ক্তিতে ২০/২২ মাত্রা পর্যন্ত পাওয়া যায়। মাত্রাবৃত্তে রচিত ৬টি (৩, ৪, ৮, ৯, ১০, ১১) ছড়ায়ও পূর্ণ ও অপূর্ণ মাত্রা—উভয় রূপই রয়েছে। এই ধারার একাদশ ছড়াটিতে অক্ষরবৃত্ত পয়ারের পরীক্ষামূলক ব্যবহার দেখা যায়। এর প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতেই ৮+৬ মাত্রা বিভাজন রয়েছে। তাই কোনো কোনো ছন্দ-বিশ্লেষক এর মধ্যে সনেটের প্রভাব লক্ষ করেছেন। আবার পঙ্‌ক্তির চলমানতার কারণে এর কোনো কোনো রচনার ছন্দ-ব্যবহারে *বলাকা*-পরবর্তী রবীন্দ্র-ছন্দের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সংজ্ঞার্থ বিবেচনায় *ছড়া*র সব রচনা ছড়ায় উত্তীর্ণ হয়েছে কি না, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিধা দেখা যায়। শুদ্ধসত্ত্ব বসু নবম রচনাটিকে অভিহিত করেছেন মজার কবিতা অভিধায়; অষ্টম ও একাদশ রচনায় লক্ষ করেছেন ছড়ার আমেজ। আবার ষষ্ঠ রচনাকে বলেছেন যথার্থ ছড়া; সপ্তমকে নিখুঁত ছড়া। এরপর তাঁর মন্তব্য (শুদ্ধসত্ত্ব ১৪০৬: ৪২৮):

> ছড়ার স্বাভাবিক চরিত্র বলতে যা বোঝায়—তা এগুলিতে অনুপস্থিত। এগুলির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ ও মিলের রাজা তিনি, জীবনের যে কোনো রকম ব্যাপারের প্রতিই তাঁর মনোনিবেশ ঘটুক, তিনি তা যেমন খুশি করে বলতে পারেন; সেই ব্যাপার ছড়া রচনাতেও ঘটেছে! 'লোকসাহিত্যে' ছড়ার বৈশিষ্ট্য বলতে তিনি যা বলেছেন, তাঁর নিজের ছড়ায় তা অনুপস্থিত থেকে গেছে, তাই পুরোপুরি লৌকিক ছড়া না বলে এগুলি এক জাতের সাহিত্যিক ছড়ার মর্যাদা পাবে।

সাহিত্যিক ছড়া অভিধাটি অবশ্য প্রথম ব্যবহার করেছিলেন আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৫৪, ১৯৬৩) তাঁর *বাংলা লোকসাহিত্য* গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর মন্তব্য এর পরের। পরে এই নিয়ে তেমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়নি। *ছড়া* পরিচিত হয়ে আছে ছড়া বলেই।

সহায়কপঞ্জি

অজিত দত্ত (১৯৬০)। *বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

অনুত্তম ভট্টাচার্য (২০০৩)। *রবীন্দ্ররচনাভিধান,* পঞ্চম খণ্ড। কলকাতা: দীপ প্রকাশন।

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯৭৩)। *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যন্ড কোম্পানী।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৪০৪)। *রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী।

কেতকী কুশারী ডাইসন ও সুশোভন অধিকারী (১৯৯৭)। *রঙের রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

নেপাল মজুমদার (১৯৯৬)। *ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ,* ষষ্ঠ খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

প্রতিমা (দেবী) ঠাকুর (১৩৪৯)। *নির্বাণ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৯৫)। *রবীন্দ্র জীবনকথা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪০১)। *রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক,* চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

বাসন্তী চক্রবর্তী (১৩৮৭)। *রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী।

মৈত্রেয়ী দেবী (১৯৬৭)। *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: রূপা অ্যাণ্ড সন্স।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪২২)। *আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ* (অনুবাদ: কবির চান্দ)। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিশার্স।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৮২)। *ছন্দ* (প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত)। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১৬)। *ছড়া*। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১৬ক) *রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড ২৬। কলকাতা: বিশ্বভারতী।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু (১৪০৬)। *রবীন্দ্রকাব্যের গোধুলি পর্যায়*। কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস।

সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত) (১৪০০)। *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*। কলকাতা।

সুকুমার সেন (১৯৯৬)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* চতুর্থ খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

সুধীরচন্দ্র কর (১৬৬৯)। *কবিকথা*। কলকাতা: সিগনেট প্রেস।